~~257~~

~~3762~~

~~Semier~~

বঙ্কিম রচনাবলী

কপালকুণ্ডলা

ভূমিকা

অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

এম. এ., পি. এইচ. ডি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
ক লি কা তা

প্রথম প্রকাশ—১৮৬৬
বিশেষ প্রথম সংস্করণ—১৯৪৭
বিশেষ দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৫২

কলিকাতা ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড সাধারণ প্রেস লিঃ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



ভূমিকা

কপালকুণ্ডলা (ইং) ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। আয়তনে এই গ্রন্থ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস হইতে ছোট; কিন্তু শিল্পকৌশলের দিক্ দিয়া বিচার করিলে ইহার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস সর্ব্বসাহিত্যে বিরল। পটভূমিরচনা, আখ্যায়িকা-গঠন চরিত্রসৃষ্টি, সাঙ্কেতিকতা—যে উপাদানের প্রতিই লক্ষ্য করা যায় দেখা যাইবে যে এই গ্রন্থ শুধু যে অনবদ্য তাহা নহে, পরম বিস্ময়কর। যখন বঙ্কিমচন্দ্র ইহা রচনা করেন ও প্রকাশ করেন তখন তাঁহার বয়স সাতাশ আটাশ বৎসর; সেই বয়সে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় দেওয়া বঙ্কিমের অনন্যসাধারণ শক্তি-

মত্তাই সূচিত করে। অপেক্ষাকৃত অপরিণত দুর্গেশনন্দিনীকে বাদ দিলে মনে হয় যে দেবরাজদুহিতা মিনার্ভার মত বঙ্কিমের প্রতিভা পরিপূর্ণ মূর্তিতে স্রষ্টার মস্তক হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য জীবন্ত মানুষ সৃষ্টি করে। ভাষা-নৈপুণ্য, কাহিনী-রচনা বা ভাব পরিবেশন— সাহিত্যের দিক্ দিয়া ইহাদের মূল্য গৌণ। প্রধান হইতেছে চরিত্রসৃষ্টি; অন্যান্য উপাদান চরিত্রকে জীবন্ত করিয়াই সার্থকতা লাভ করে। 'কপালকুণ্ডলায়' দুইটি পরমাশ্চর্য্য রমণীর চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে; তাহাদের মধ্যে একজন প্রকৃতিপালিতা, সমাজের প্রভাব মুক্তা; অপর রমণীর চরিত্র সামাজিক জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাদের চরিত্রের বিভিন্নতা হইতে নিসর্গশোভা ও সমাজের জটিল ও সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে তুলনা করিয়া কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন হইবে না। তবু ইহা মানিতেই হইবে যে এই দুই রমণীর চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য যেমন তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমনি তীব্রতা লাভ করিয়াছে ইহাদের পরিবেশের বৈষম্য।

প্রথমে নায়িকা কপালকুণ্ডলার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের বিচার করা যাইতে পারে। ইনি বাল্যে পর্ত্তুগীজ দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হইয়া সমুদ্রসৈকতে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। তারপর ইহার প্রধান সঙ্গী হইল নিসর্গ-শোভা—আকাশের ও সমুদ্রের বিস্তার ইহার মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল; ইহারা ও সমুদ্রতীরস্থ বনানী কপালকুণ্ডলার মনে এক অপরূপ আকর্ষণ জাগাইত। শুধু তাহাই নহে। নিসর্গ-শোভা স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কিন্তু ইহা অমানবীয়; তাই মানুষ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতি রহস্যময়ীই থাকিয়া যায়। প্রকৃতির শোভা আমাদিগকে মুগ্ধ করে, অভিভূত করে; তাহার মধ্যে এমন একটি লীলাময় মায়াআছে যাহাকে আমরা ধরিতে পারিনা; যাহাকে স্পর্শ করিতে গেলে দেখি যে সে পলাইয়া যায়, যাহা অতিপরিচিত হইলেও দূরবর্তী রহিয়া যায়। এই যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য ও চঞ্চল মোহিনী শক্তি ইহা প্রকৃতিপালিতা কপালকুণ্ডলায় সংক্রমিত হইয়াছে। যখন নবকুমার তাঁহাকে প্রথম দেখিলেন তখন তিনি প্রকৃতির শোভার অঙ্গীভূত হইয়াই প্রতিভাত হইলেন, যখন তিনি কথা বলিলেন তখন "পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল।" যখন তিনি চলিতে লাগিলেন তখনও তাঁহাকে অশরীরী মায়া বলিয়া মনে হইতে লাগিল; তাঁহার অলক্ষিত পদবিক্ষেপের সঙ্গে বসন্তকালের মন্দানিলসঞ্চালিত শুভ্রমেঘের সঞ্চরণের তুলনা হইতে পারে। তাঁহার আবির্ভাব, অন্তর্ধান ও ক্রিয়াকলাপ নিসর্গ-শোভার মতই লীলাচঞ্চল ও রহস্যময়। পরে তিনি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াও নবকুমারকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম দর্শনে তিনি নবকুমারকে সতর্ক করেন নাই, এমন কি তিনিই নবকুমারকে পথ দেখাইয়া কাপালিকের কুটীরে লইয়া আসিলেন। কাপালিক-

নবকুমারকে যথার্থ লইয়া যাইবার পূর্ব্বে কপালকুণ্ডলা আর তাঁহার কাছে আসেন নাই। কেন আসেন নাই, কেন পূর্ব্বে সতর্ক করেন নাই, কোথায় তিনি থাকিতেন, এই সকল প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। যখন পথিমধ্যে তিনি নবকুমারকে পলায়ন করিবার উপদেশ দিলেন তখনও তাঁহাকে বিদ্যুৎ-চঞ্চলা মায়া বলিয়াই মনে হইয়াছে। যখন খড়্গহস্তে জীবনদাত্রীরূপে তিনি নবকুমারের কাছে উপস্থিত হইলেন তখনও তিনি অর্দ্ধেক মানবী, অর্দ্ধেক মোহিনী-মায়া—তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে। কেহ কেহ কপালকুণ্ডলার সঙ্গে শকুন্তলা ও মীরাণ্ডার তুলনা করিয়া থাকেন। এই তুলনা অনেক দিক্ দিয়াই ভ্রান্ত। মীরাণ্ডা সমুদ্র-উপকূলে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সমুদ্র-শোভার অঙ্গ বলিয়া মনে হয় না। শকুন্তলা তরুমূলে জল সেচন করিতেন, বনজ্যোৎস্নাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, মৃগশিশুকে সন্তানবৎপ্রতিপালন করিয়াছেন, পতিগৃহে যাইবার সময় ইহাদের নিকট হইতে করুণভাবে বিদায় লইয়াছেন। ইহাতে শকুন্তলার অনুভূতির বিস্তৃতি প্রমাণিত হয়, কিন্তু শকুন্তলা সম্পূর্ণা মানবীই রহিয়া গিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার অধরের সঙ্গে কিশলয়রাগের, তাঁহার বাহুর সঙ্গে কোমল বিটপের এবং তাঁহার যৌবনের সঙ্গে লোভনীয় কুসুমের তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যে অলৌকিকের কোন স্পর্শ নাই। প্রকৃতির মধ্যে যে-অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিত আছে, নিসর্গশোভা যে-অনৈসর্গিক মহিমার বহিঃ-প্রকাশমাত্র, সেই দুর্জ্ঞেয়, রহস্যময়, লীলাচপল শক্তিকে যদি কেহ কোথাও পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারিয়া থাকেন, তবে তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা।

কপালকুণ্ডলাকে যদি শুধু নিসর্গমায়ার অন্তর্ভূক্ত বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলে তাঁহার চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে না। তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন সমুদ্রতীরে মনুষ্যসমাজ হইতে বহুদূরে; তাঁহার প্রতিপালক শক্তিউপাসক দুরন্ত কাপালিক। তান্ত্রিক কাপালিকেরা লোকালয় হইতে দূরে নির্জ্জন বনে নরদেহের উপর উপবেশন করিয়া কালীর সাধনা করিতেন; তাঁহাদের সাধনার অন্যতম উপকরণ নরকপালস্থিত তেজস্বী আসব। কাপালিকেরা অন্যান্য বীভৎস আচারও পালন করিতেন এবং এই সকল কারণে ইহারা অতিশয় হিংস্রস্বভাব বিশিষ্ট হইতেন। কিন্তু এই সাধনার মূলে রহিয়াছে শক্তির উপাসনা এবং সেই উপাসনার সাহায্যে মোক্ষলাভ। তান্ত্রিকের সাধনা লোকালয় হইতে দূরে আচরিত হয় এবং মানুষের হত্যা যে সাধনার অঙ্গ তাহার সঙ্গে মনুষ্যসমাজের সম্পর্ক থাকিতে পারে না। কপালকুণ্ডলা আশৈশব এই সাধনার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন; এই সাহচর্য তাঁহাকে মনুষ্যসমাজসম্পর্কে উদাসীনই করিয়াছে এবং ভগবানের যে রূপ তাঁহার মনে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা প্রলয়ঙ্করী শক্তির রূপ। অধিকারীও তাঁহাকে এই কালীকেই উপাসনা করিতে শিখাইয়াছেন, যদিও অধিকারী

কোমলস্বভাববিশিষ্ট এবং তিনি কালীকে জগতের মাতা বলিয়া পূজা করিতেন। এই উভয়ের সাহচর্য্যে আসিয়া কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে গভীর ধর্ম্মমোহ অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহার ভক্তি সাংসারিক ব্যাপারের মধ্য দিয়া সঞ্জীবিত হয় নাই ; তিনি পূজা করিয়াছেন এক লোকাতীত শক্তিকে যিনি ভয়ঙ্করী, যিনি জগন্মাতা, যাঁহার নির্দ্দেশ অলঙ্ঘনীয়, অনমনীয়। প্রকৃতির সুগভীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি লৌকিক জীবন সম্পর্কে উদাসীন হইয়াছিলেন ; তাঁহার ভক্তিপ্রবণতা এই ঔদাসীন্যকে আরও বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

এই উভয় শক্তির প্রভাব তাঁহার চরিত্রের উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল ; লৌকিক কর্ম্মের মধ্যে তিনি অলৌকিকের অঙ্গুলিসঙ্কেত অনুসন্ধান করিতেন এবং সেই সঙ্কেতকে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেন। সাংসারিক জীবনে যে সব ধর্ম্মান্ধলোক দেখা যায় প্রায়শঃ তাহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠায় একটি সঙ্কীর্ণতা থাকে ; তাহা ঐহিকের সামান্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তির জন্য নিয়োজিত হয় অথবা অকিঞ্চিৎকর আচার পালনে তাহা নিঃশেষিত হয়। কপাল-কুণ্ডলার ধর্ম্মবিশ্বাসে এই ক্ষুদ্রতা নাই। তাঁহার কোন ঐহিক কামনা নাই ; শুধু সকল কর্ম্মে তিনি ভবানীর সুনির্দ্দেশ্য সঙ্কেত খুঁজিতেন ও দেখিতে পাইতেন। এই কারণে তাঁহার সীমাবদ্ধ জীবনের উপরে অসীমের রেখাপাত হইয়াছে এবং তাঁহার চরিত্রে ও কর্ম্মে যাহা কিছু খাপ্‌ছাড়া ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় তাহারও সুসমঞ্জস মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন যে পরোপচিকির্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি; সংসারের স্বার্থদিগ্ধ পথে পরিভ্রমণ করেন নাই বলিয়াই হউক অথবা স্বাভাবিক প্রাবল্যের জন্যই হউক কপালকুণ্ডলা নরবলি সহ্য করিতে পারিতেন না এবং সর্ব্বদা পরের উপকার করিতে উদ্যত হইতেন।* এই প্রবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তিনি নবকুমারের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিশ্বশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখবিধায়িনী, কৈবল্য-দায়িনী ভৈরবীকে তিনি এমনি অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইয়াছিলেন যে নিজের জীবনের প্রতি তাঁহার কোন মমত্ব জন্মায় নাই। তিনি যে বিবাহে সম্মতি দিলেন তাহার কারণ তিনি ইহার মধ্যে করালীর ইঙ্গিত দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সপ্তগ্রামে সাংসারিক জীবনে যে মন বসাইতে পারিলেন না তাহার একটি কারণ সমুদ্রতীরের উন্মুক্ত প্রকৃতির আকর্ষণ ; অপর কারণ এই যে আসিবার সময় তাঁহার দেওয়া অভিন্ন বিল্বপত্র ভবানী গ্রহণ করেন নাই। যিনি সকল বিষয়ে অনৈসর্গিক শক্তির ইঙ্গিত সন্ধান করেন, তিনি যে জীবনের সঙ্কটমূহূর্ত্তে স্বপ্নের মধ্যে নিগূঢ় নির্দ্দেশ দেখিতে পাইবেন ইহা একান্ত স্বাভাবিক।

---

* 'কপালকুণ্ডলা' নামটি সংস্কৃত নাটক 'মালতীমাধব' হইতে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত নাটকে কপালকুণ্ডলা কাপালিক সন্ন্যাসী অঘোর ঘণ্টের শিষ্যা ও সহকারিণী। তিনি প্রাণরক্ষা করেন না, বরং প্রাণিহত্যায় কাপালিককে সাহায্য করেন। এই নাটকেও কপালকুণ্ডলা খড়্গ ধারণ করিয়াছেন ; তবে তাহা বধ করিবার উদ্দেশ্যে নহে, প্রাণ রক্ষার উদ্দেশ্যে।

সেই স্বপ্নে তাঁহার নৌকা জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছে এবং তিনি শুনিতে পাইলেন ভবানী কাপালিকের কাছে তাঁহার জীবন প্রার্থনা করিয়াছেন। কাপালিক ও নবকুমার যখন তাঁহাকে বধার্থ প্রেতভূমে লইয়া যাইতেছিলেন তখন তিনি আকাশে নবনীরদনিন্দিতমূর্ত্তি ভৈরবীকে দেখিতে পাইলেন ; ভৈরবী যেন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে প্রাণবিসর্জ্জনের নির্দ্দেশ দিলেন এবং কপালকুণ্ডলা দেবীর চরণে নিজেকে বলি দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কপালকুণ্ডলা যে এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন ইহার মূলে প্রকৃতির আকর্ষণ ও ধর্ম্মমোহ অবশ্যই ছিল। কিন্তু ইহার একটি প্রধান কারণ তাঁহার সংসারের প্রতি অনাসক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুজ পূর্ণচন্দ্র লিখিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে একটি প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে যদি কোনও স্ত্রীলোক সমাজের বাহিরে সমুদ্রতীরে বনমধ্যে প্রতিপালিত হয় এবং পরে বিবাহ হইলে সমাজ-সংসর্গে আসে, তাহা হইলে তাহার বন্যপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইবে কিনা এবং কাপালিকের প্রভাব পরবর্ত্তী কালেও তাহার উপরে থাকিবে কিনা। এই বিষয়টি লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা, উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। কপাল-কুণ্ডলার একবৎসর কাল গৃহিণী থাকার পর তাঁহার চরিত্রের কিছু কিছুপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন স্থায়ী বা গভীর হয় নাই। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রণয়প্রবৃত্তির অভাব। কেহ কেহ মনে করেন যে এইরূপ অপরিণতি অস্বাভাবিক ; একবৎসর কাল নবকুমারের ঘরে থাকিয়া কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে আসঙ্গলিপ্সা জাগিবে না ইহা হইতে পারে না। এই প্রশ্নের আলোচনার সময় একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। সাহিত্যের চরিত্র বাঁচিয়া থাকে সাহিত্যের মধ্যেই, সেইখানে সে সম্পূর্ণরূপে প্রাণবন্ত, সাহিত্যের বাহিরে তাহার কোন সত্তা নাই। অপর রমণী কপালকুণ্ডলার অবস্থায় পড়িলে কি করিত অথবা কপালকুণ্ডলার কি করা উচিত ছিল তাহা বিচার্য্য নহে। উপন্যাসের পক্ষে ইহাই চরম সার্থকতা যে তাহার মধ্যে কপালকুণ্ডলার সকল কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। প্রণয়ের অভাবের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে সাগরতীরের প্রতি আকর্ষণ ও ভবানীর নির্দ্দেশ। ভবানী যে তাঁহার বিল্বপত্র গ্রহণ করেন নাই তাহা বিবাহিত জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে তাঁহাকে সন্দিহান করিয়াছে ; আর সাগরতীরের আকর্ষণ তাঁহাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে গৃহিণী-পণার মোহ তাঁহাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে নাই। প্রণয়-প্রবৃত্তি সকলের হৃদয়ে সমানভাবে জাগ্রত হয় না ; কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে ইহা যে অতিশয় অপরিণত ছিল তাহার সঙ্গত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার সপত্নী পদ্মাবতীও অসাধারণ রমণী ; তাঁহার চরিত্র পরিপুষ্ট হইয়াছে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিবেশের মধ্যে। কপালকুণ্ডলা প্রতিপালিত হইয়াছেন লোকালয়ের

বাহিরে সমুদ্রতীরে বনানীর মধ্যে, মতিবিবি-প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিমণ্ডলে, আগ্রার রাজপ্রাসাদে ; সেইখানে তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে। নানাবিদ্যার চর্চ্চায় কল্পনা ও রসবোধ পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, মনের আকাঙ্ক্ষা সাধারণ নীতি-জ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই। প্রত্যেকের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে এক বিরাট পটভূমিকার পুরোভাগে, কিন্তু সেইখানেও প্রভেদের অন্ত নাই। এক দিকে রহিয়াছে আকাশ, সমুদ্র ও নিবিড় বন ; অপর দিকে রহিয়াছে ভারত ইতিহাসের এক বিরাট্ অংশ যেখানে সাম্রাজ্যের ভাগ্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে। এই উভয় পটভূমিকার সান্নিধ্যে এই দুইটি রমণীর চরিত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে এবং ইহাদের ভিতরকার পার্থক্য সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলার কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষা নাই ; ঔপন্যাসিক নিজেই বলিয়াছেন, "এ সংসার-বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না।" অপর পক্ষে লুৎফ-উন্নিসার আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। সেও স্বাধীনতা খুঁজিয়াছে কিন্তু সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইবারস্বাধীনতা নহে, সংসারে থাকিয়া প্রবৃত্তির যথেচ্ছ পরিতৃপ্তির স্বাধীনতা। কপালকুণ্ডলা একটি গৃহের কর্তৃত্বও চাহেন নাই, লুৎফ-উন্নিসা বাদশাহেরও বাদশাহ হওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলার ধর্ম্মবিশ্বাস এত প্রগাঢ় ছিল যে তিনি আত্মবিসর্জ্জন সম্পর্কেও সঙ্কোচশূন্যা ছিলেন ; লুৎফ-উন্নিসার ধর্ম্মবোধ এত শিথিল ছিল যে তিনি রাজপ্রাসাদে বহু পুরুষের সংসর্গে আসিলেও কাহাকেও কোনদিন ভালবাসেন নাই এবং যে সেলিমের তিনি প্রণয়ভাগিনী ছিলেন তাঁহারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। প্রণয়ের বন্ধনকে স্বীকার করিতে পারিলেন না বলিয়া কপালকুণ্ডলা বনচর হইতে চাহিলেন, লুৎফ-উন্নিসা পুষ্পে পুষ্পে বিহরণের শূন্যতা বুঝিতে পারিয়া নবকুমারের গৃহিণী হইবার জন্য আগ্রার রাজ-প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন। উড়িষ্যার পথে ইহাদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; সেই দিন পরস্পরের প্রতি চাহিয়া ইহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহাদের সর্ব্বশেষ সাক্ষাতের দিনেও সেই বিস্ময় ঘুচে নাই, একে অপরের কাছে দুর্জ্ঞেয় রহিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থে কোন ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই। কিন্তু তিনি এমনি সুকৌশলে ঘটনার সমাবেশ এবং চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়াছেন যে সর্ব্বত্র অনুভব করা যায় যে হয়ত কোন অনৈসর্গিক শক্তি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং মানুষের হৃদয়েই সে আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই রীতি বিশেষভাবে শেক্সপীয়রীয় রীতি। এই গ্রন্থের অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে সমুদ্রের উপকূলে, তীরস্থিত স্তূপ-শিখরে, নদীর তীরে, কাননতলে ; সর্ব্বাপেক্ষা তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাপার সাধিত হইয়াছেপ্রদোষেঅথবা অন্ধকারে। স্থান ও কালের এই সঙ্গতি লোকাতীত শক্তির ইঙ্গিত দেয় এবং এই ইঙ্গিত নানাভাবে

সমর্থিত হয়। তান্ত্রিকের পৈশাচিক আচার, অধিকারীর ধর্ম্মবিশ্বাস এবং কাপালিক ও কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বাদ দিলেও এমন অনেক সঙ্কেতময় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে যাহা দৈবের অঙ্গুলিসঞ্চালনের আভাস দেয়। বিবাহের পর কপালকুণ্ডলা কালীর পদতলে অভিন্ন বিল্বপত্র দিয়াছিলেন, সেই বিল্বপত্র প্রতিমাচরণচ্যুত হইলে বিষণ্ণ হইয়া অধিকারী কহিলেন, "এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানেগেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে।" গ্রন্থের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়াছে প্রেতভূমে যেখানে নবকুমারের সঙ্গে সঙ্গে কপালকুণ্ডলা গিয়াছেন এবং শেষে উভয়ে নদীর তরঙ্গমালায় মিলাইয়া গিয়াছেন। ইহা কি একেবারেই আকস্মিক না ইহার মধ্যে নিয়তির নির্দ্দেশ রহিয়াছে? যদি নিয়তির লীলাই না থাকিবে তাহা হইলে কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর পত্র হারাইবেন কেন, সেই পত্র তাহার অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তেই নবকুমারের হাতে পড়িবে কেন এবং পত্র খুঁজিতে যাইয়া কপালকুণ্ডলাই বা আলুলায়িত কুন্তলা হইবেন কেন? এই সকল ব্যাপার আপাতঃ দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও আকস্মিক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কাহিনীর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করিলে ইহাদের মধ্যে নিগূঢ় অর্থের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

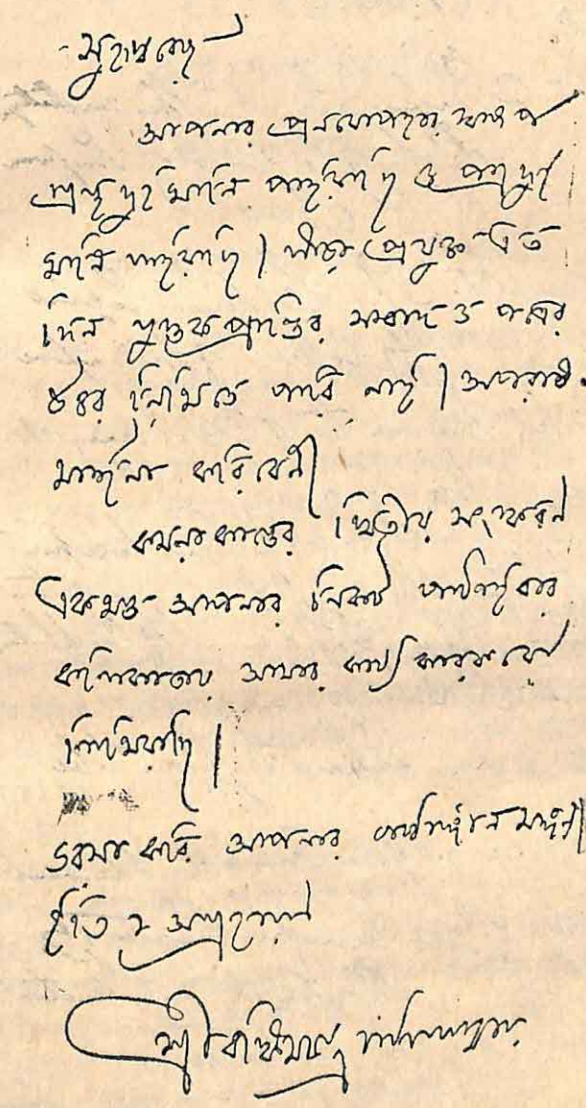
চরিত্রসৃষ্টির মধ্যেও এই সঙ্কেতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে সন্দেহ ও ঈর্ষ্যার দ্বারা দগ্ধ হইয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রবৃত্তি, কিন্তু ঘটনার পরম্পরা বিচার করিলে সন্দেহ হয় যে, তিনি দৈবাহত, তাঁহার সন্দেহ ভৈরবীপ্রেরিত। বাস্তবিক পক্ষে মানব হৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলি মানবের নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও অনেকসময় তাহারা মানুষকে এমন অন্ধ আবেগের সহিত চালিত করে যে আমাদের সন্দেহ হয় যে হয়ত তাহাদের এই অপ্রতিরোধনীয় গতি কোন বাহিরের শক্তি হইতে আহৃত হয়। যদি তাহারা অন্তর্লীন প্রবৃত্তিমাত্র হইবে তবে মানুষ তাহাদিগকে সংযত করিতে পারিবে না কেন? নিয়তির এই সঙ্কেত বিশেষ করিয়া পাওয়া যায় লুৎফ-উন্নিসার চরিত্রের পরিণতিতে। 'লুৎফ-উন্নিসা "প্রকৃতিচপলা যোষিৎ'; স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় আগ্রার রাজপ্রাসাদের নন্দন-নরকে বহু প্রণয়ীকে কৃপাবিতরণ করিয়াছেন। স্বীকার করা যাইতে পারে যে ইন্দ্রিয়লালসার সঙ্গে বাহিরের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যে সময় তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হইল, সেই সময়ই তাঁহার পূর্ব্বপতি নবকুমার শর্ম্মার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল কেন? মানিয়া লইতে পারি যে এই সাক্ষাৎ একান্তভাবে আকস্মিক, কিন্তু এই অপ্রাপণীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ জন্মিবে কেন? "আকাশে চন্দ্রসূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?" ইহার একমাত্র উত্তর—"ললাটলিখন।"

লুৎফ-উন্নিসা স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের লোক ; কিন্তু তিনিও অনুভব করিয়াছেন যে মানুষের সকল অনুভূতি ও প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে—ললাটলিখন।

কাহিনীর গঠনকৌশল এই উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য। আমি অন্যত্র এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থে দুইটি রমণীর বিচিত্র কাহিনীকে অতি অপরূপভাবে একত্রিত করা হইয়াছে। গ্রন্থের একদিকে রহিয়াছে পশ্চিমভারতস্থিত আগ্রার রাজধানী, অপরদিকে রহিয়াছে পূর্ব্বউপকূলবর্ত্তী নিবিড় বন। অথচ কোথাও জটিলতা নাই, কোথাও বহু ঘটনার বা বর্ণনার বাহুল্য নাই ; যে চরিত্রের সম্পর্কে যতটুকু জানা প্রয়োজন শুধু ততটুকুই বিবৃত হইয়াছে, কোথাও বা আতিশয্য বা ন্যূনতা নাই। মেহের-উন্নিসার চরিত্রের একটি অপরূপ প্রতিচ্ছবি দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তিনি অপ্রধান বলিয়া তাঁহাকে বিস্তারিতভাবে অঙ্কিত করা হয় নাই। গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ বিষয় কপালকুণ্ডলার বিবাহ ও মৃত্যু ; গ্রীক্ ট্রাজেডির মত সকল ঘটনা ও অন্যসকল চরিত্র অনিবার্য্যভাবে কাহিনীকে তাহার বিষাদময় পরিণতির দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। পটভূমিকা যত বিশালই হউক তাহা মূল চিত্রকে অস্পষ্ট করিতে পারে নাই ; রাজনৈতিক উত্থানপতন বা তান্ত্রিকের সাধনা যতই বিস্ময়কর হউক, সেই সকল ব্যাপার উপন্যাসকে মুহূর্ত্তের জন্যও কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারে নাই। এই কেন্দ্র হইতেছে কপালকুণ্ডলার জীবনের পরিণতি ও তাঁহার চরিত্রের রহস্য। ঔপন্যাসিক সর্ব্বত্র লক্ষ্য করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাহিরের প্রতিবেশ ও সঙ্কেত যত অর্থপূর্ণই হউক না কেন সর্ব্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও বিস্ময়কর রহস্য নিহিত রহিয়াছে মনুষ্য-হৃদয়ে। যিনি সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন, তিনিই স্রষ্টা।

প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সাল।

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত


সুহৃদ্বরেষু
আপনার [illegible]
[illegible] পাইয়াছি ও [illegible]
[illegible] পাইয়াছি। কিন্তু প্রত্যুত্তর দিতে
দিন পুস্তক প্রাপ্তির সম্বাদ ও পত্রের
উত্তর লিখিতে পারি নাই। অপরাধ
মার্জ্জনা করিবেন।
কমলাকান্তের দ্বিতীয় সংস্করণ
একখণ্ড আপনার নিকট পাঠাইবার
জন্য কলিকাতায় আমার কার্য্যকারককে
লিখিয়াছি।
[illegible] করি আপনার [illegible] মঙ্গল।
ইতি ২ অগ্রহায়ণ
শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা হাতের লেখা চিঠি]

No. 82.

From Baboo Bunkim Chunder Chatterjee
Deputy Collector of Negwan

To

J. R. Cockerell Esquire
Offg Collector of Midnapore

Dated Negwan the 9th February 1860

Sir,

I have the honor to report that I have this day taken charge of the Negwan Office. The amount of Cash balance in hand is Rs. 5 .. a .. p. 2 1/2.

I have the honor to be
Sir
Your most Obedt servant
Bunkim Chunder Chatterjee
Deputy Collector

[বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী হাতের লেখা চিঠি]

কপালকুণ্ডলা

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাগর-সঙ্গমে

Floating straight obedient to the stream.
—Comedy of Errors.

সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর পূর্বে একদিন মাঘমাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা
গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে
যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল ; কিন্তু এই নৌকা-
রোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত
করিয়াছিল ; নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল।
এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছু নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ
অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। এক জন প্রাচীন এবং এক জন যুবা পুরুষ, এই দুই
জন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন।
বারেক কথাবার্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, আজ
কত দূর যেতে পারবি ?" মাঝি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বলিতে পারিলাম না।"

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া মাঝিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। যুবক কহিলেন, "মহাশয়,
যাহা জগদীশ্বরের হাত, তাহা পণ্ডিতে বলিতে পারে না—ও মূর্খ কি প্রকারে বলিবে ?
আপনি ব্যস্ত হইবেন না।"

বৃদ্ধ উগ্রভাবে কহিলেন, "ব্যস্ত হব না ? বল কি, বেটারা বিশ পঁচিশ বিঘার ধান
কাটিয়া লইয়া গেল, ছেলেপিলে সংবৎসর খাবে কি ?"

এ সংবাদ তিনি সাগরে উপনীত হইলে পরে পশ্চাদাগত অন্য যাত্রীর মুখে পাইয়া-
ছিলেন। যুবা কহিলেন, "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, মহাশয়ের বাটীতে অভিভাবক
আর কেহ নাই—মহাশয়ের আসা ভাল হয় নাই।"

প্রাচীন পূর্ব্ববৎ উগ্রভাবে কহিলেন, "আসব না ? তিন কাল গিয়ে এককালে
ঠেকেছে। এখন পরকালের কর্ম্ম করিব না ত কবে করিব ?"

যুবা কহিলেন, "যদি শাস্ত্র বুঝিয়া থাকি, তবে তীর্থদর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম্ম হয়
বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতে পারে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "তবে তুমি এলে কেন ?"

যুবা উত্তর করিলেন, "আমি ত আগেই বলিয়াছি যে, সমুদ্র দেখিব বড় সাধ ছিল,

সেই জন্যই আসিয়াছি।" পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আহা! কি দেখিলাম! জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না।

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

বৃদ্ধের শ্রুতি কবিতার প্রতি ছিল না, নাবিকেরা পরস্পর যে কথোপকথন করিতেছিল, তাহাই একতানমনা হইয়া শুনিতেছিলেন।

এক জন নাবিক অপরকে কহিতেছিল,—"ও ভাই—এ ত বড় কাজটা খারাবি হলো—এখন কি বারদরিয়ায় পড়লেম—কি কোন্ দেশে এলেম, তা যে বুঝতে পারি না।

বক্তার স্বর অত্যন্ত ভয়কাতর। বৃদ্ধ বুঝিলেন যে, কোন বিপদ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। সশঙ্কচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাঝি, কি হয়েছে?" মাঝি উত্তর করিল না। কিন্তু যুবক উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন যে, প্রায় প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ অতি গাঢ় কুজ্ঝটিকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে; আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, উপকূল কোন্ দিকে কিছুই দেখা যাইতেছে না। বুঝিলেন, নাবিকদিগের দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ দিকে যাইতেছে, তাহার নিশ্চয়তা পাইতেছে না।—পাছে বাহিরসমুদ্রে পড়িয়া অকূলে মারা যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াছে।

হিমনিবারণ জন্য সম্মুখে আবরণ দেওয়া ছিল, এ জন্য নৌকার ভিতর হইতে আরোহীরা এ সকল বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু নব্য যাত্রী অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধকে সবিশেষ কহিলেন; তখন নৌকা-মধ্যে মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। যে কয়টি স্ত্রীলোক নৌকামধ্যে ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ কথার শব্দে জাগিয়াছিল, শুনিবামাত্র তাহারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, প্রাচীন কহিল, "কেনারায় পড়! কেনারায় পড়।"

নব্য ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "কেনারা কোথা? তাহা জানিতে পারিলে এত বিপদ্ হইবে কেন?"

ইহা শুনিয়া নৌকারোহীদিগের কোলাহল আরও বৃদ্ধি পাইল। নব্য যাত্রী কোন মতে তাঁহাদিগকে স্থির করিয়া নাবিককে কহিলেন, "আশঙ্কার বিষয় কিছু নাই, প্রভাত হইয়াছে—চারি পাঁচ দণ্ডের মধ্যে অবশ্য সূর্য্যোদয় হইবে। চার পাঁচ দণ্ডের মধ্যে নৌকা কদাচ মারা যাইবে না। তোমরা এক্ষণে বাহন বন্ধ কর, স্রোতে নৌকা যথায় যায় যাক্; পশ্চাৎ রৌদ্র হইলে পরামর্শ করা যাইবে।"

নাবিকেরা এই পরামর্শে সম্মত হইয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নাবিকেরা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। যাত্রীরা ভয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। বায়ুমাত্র নাই। সুতরাং তাঁহারা তরঙ্গান্দোলনকম্প বড় জানিতে পারিলেন না। তথাপি সকলেই মৃত্যু নিকট নিশ্চিত করিলেন। পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দ-বিন্যাসে কাঁদিতে লাগিল।

একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিল, ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—সেই কেবল কাঁদিল না।

প্রতীক্ষা করিতে করিতে অনুভবে বেলা প্রায় এক প্রহর হইল। এমত সময়ে অকস্মাৎ নাবিকেরা দরিয়ার পাঁচপীরের নাম কীর্ত্তন করিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি! কি! মাঝি, কি হইয়াছে?" মাঝিরাও একবাক্যে কোলাহল করিয়া কহিতে লাগিল, "রোদ উঠেছে! রোদ উঠেছে! ডাঙ্গা! ডাঙ্গা! ডাঙ্গা।" যাত্রীরা সকলেই ঔৎসুক্য-সহকারে নৌকার বাহিরে আসিয়া, কোথায় আসিয়াছেন, কি বৃত্তান্ত, দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন সূর্য্য প্রকাশ হইয়াছে, কুজ্ঝটিকার অন্ধকাররাশি হইতে দিঙ্মণ্ডল একেবারে বিমুক্ত হইয়াছে। বেলা প্রায় প্রহরাতীত হইয়াছে। যে স্থানে নৌকা আসিয়াছে, সে প্রকৃত মহাসমুদ্র নহে, নদীর মোহানা মাত্র, কিন্তু তথায় নদীর যেরূপ বিস্তার, সেরূপ বিস্তার আর কোথাও নাই। নদীর এক কূল নৌকার অতি নিকটবর্ত্তী বটে—এমন কি পঞ্চাশৎ হস্তের মধ্যগত; কিন্তু অপর কূলের চিহ্ন দেখা যায় না। আর যে দিকেই দেখা যায়, অনন্ত জলরাশি, চঞ্চল রবিরশ্মিমালা-প্রদীপ্ত হইয়া গগন-প্রান্তে গগন-সহিত মিশিয়াছে। নিকটস্থ জল, সচরাচর সকর্দ্দম নদীজলবর্ণ। কিন্তু দূরস্থ বারিরাশি—নীলপ্রভ। আরোহীরা নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহারা মহাসমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছেন। তবে সৌভাগ্য এই যে, উপকূল নিকটে, আশঙ্কার বিষয় নাই। সূর্য্যপ্রতি দৃষ্টি করিয়া দিক্ নিরূপিত করিলেন। সম্মুখে যে উপকূল দেখিতেছিলেন, সে সহজেই সমুদ্রের পশ্চিম তট বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল। তটমধ্যে নৌকার অনতিদূরে এক নদীর মুখ মন্দগামী কলধৌত-প্রবাহবৎ আসিয়া পড়িতেছিল। সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে বৃহৎ সৈকতভূমিখণ্ডে টিট্টিভাদি পক্ষিগণ অগণিত সংখ্যায় ক্রীড়া করিতেছিল। এই নদী এক্ষণে "রসুলপুরের নদী" নাম ধারণ করিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপকূলে

"Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!"

—King Lear.

আরোহীদিগের স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক কথা সমাপ্ত হইলে, নাবিকেরা প্রস্তাব করিল যে, জোয়ারের আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে;—এই অবকাশে আরোহিগণ সম্মুখস্থ সৈকতে পাকাদি সমাপন করুন, পরে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভেই স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিতে পারিবেন। আরোহিবর্গও এই পরামর্শে সম্মতি দিলেন; তখন নাবিকেরা তরী তীরলগ্ন করিলে, আরোহিগণ অবতরণ করিয়া স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাদির পর পাকের উদ্যোগে আর এক নূতন বিপত্তি উপস্থিত হইল—নৌকায়

পাকের কাষ্ঠ নাই। ব্যাঘ্রভয়ে উপর হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। পরিশেষে সকলের উপবাসের উপক্রম দেখিয়া প্রাচীন, প্রাগুক্ত যুবাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু নবকুমার! তুমি ইহার উপায় না করিলে আমরা এতগুলি লোক মারা যাই।"

নবকুমার কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আচ্ছা, যাইব; কুড়ালি দাও, আর দা লইয়া এক জন আমার সঙ্গে আইস।"

কেহই নবকুমারের সহিত যাইতে চাহিল না।

"খাবার সময় বুঝা যাবে" এই বলিয়া নবকুমার কোমর বাঁধিয়া একাকী কুঠার-হস্তে কাষ্ঠাহরণে চলিলেন।

তীরোপরি আরোহণ করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, যতদূর দৃষ্টি চলে, তত দূর মধ্যে কোথাও বসতির লক্ষণ কিছুই নাই। কেবল বনমাত্র। কিন্তু সে বন, দীর্ঘ বৃক্ষাবলীশোভিত বা নিবিড় বন নহে;—কেবল স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ মণ্ডলাকারে কোন কোন ভূমিখণ্ড ব্যাপিয়াছে। নবকুমার তন্মধ্যে আহরণযোগ্য কাষ্ঠ দেখিতে পাইলেন না; সুতরাং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধানে নদীতট হইতে অধিক দূরে গমন করিতে হইল। পরিশেষে ছেদনযোগ্য একটি বৃক্ষ পাইয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সমাহরণ করিলেন। কাষ্ঠ বহন করিয়া আনা আর এক বিষম কঠিন ব্যাপার বোধ হইল; নবকুমার দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, এ সকল কর্ম্মে অভ্যাস ছিল না; সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কাষ্ঠ আহরণে আসিয়াছিলেন কিন্তু এক্ষণে কাষ্ঠভার বহন বড় ক্লেশকর হইল। যাহাই হউক, যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাতে অল্পে ক্লান্ত হওয়া নবকুমারের স্বভাব ছিল না। এ জন্য তিনি কোন মতে কাষ্ঠভার বহিয়া আনিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর বহেন, পরে ক্ষণেক বসিয়া বিশ্রাম করেন, আবার বহেন; এইরূপে আসিতে লাগিলেন।

এই হেতুবশতঃ নবকুমারের প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে সমভিব্যাহারিগণ তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিল; তাহাদিগের এইরূপ আশঙ্কা হইল যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। সম্ভাব্য কাল অতীত হইলে এইরূপই তাহাদিগের হৃদয়ে স্থির সিদ্ধান্ত হইল। অথচ কাহারও এমন সাহস হইল না যে, তীরে উঠিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার অনুসন্ধান করে।

নৌকারোহিগণ এইরূপ কল্পনা করিতেছিল; ইত্যবসরে জলরাশিমধ্যে ভৈরব কল্লোল উত্থিত হইল। নাবিকেরা বুঝিল যে,—জোয়ার আসিতেছে। নাবিকেরা বিশেষ জানিত যে, এ সকল স্থানে জলোচ্ছ্বাসকালে তটদেশে এরূপ প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত হয় যে, নৌকাদি তীরবর্ত্তী থাকিলে, তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এ জন্য তাহারা অতি ব্যস্তে নৌকার বন্ধন মোচন করিয়া নদীমধ্যবর্ত্তী হইতে লাগিল। নৌকা মুক্ত হইতে না হইতেই সম্মুখস্থ সৈকতভূমি জলপ্লুত হইয়া গেল, যাত্রিগণ কেবল ত্রস্তে নৌকায় উঠিতে অবকাশ পাইয়াছিল, তণ্ডুলাদি যাহা চরে স্থির হইয়াছিল, তৎসমুদয় ভাসিয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নাবিকেরা সুনিপুণ নহে; নৌকা সামলাইতে পারিল না; প্রবল জলপ্রবাহবেগে তরণী রসুলপুর নদীর মধ্যে লইয়া চলিল। একজন আরোহী কহিল,

"নবকুমার রহিল যে ?" একজন নাবিক কহিল, "আঃ, তোর নবকুমার কি আছে ? তাকে শিয়ালে খাইয়াছে।"

জলবেগে নৌকা রসুলপুরের নদীর মধ্যে লইয়া যাইতেছে। প্রত্যাগমন করিতে বিস্তর ক্লেশ হইবে, এই জন্য নাবিকেরা প্রাণপণে তাহার বাহিরে আসিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন কি, সেই মাঘমাসে তাহাদিগের ললাটে স্বেদস্রুতি হইতে লাগিল ; এইরূপ পরিশ্রম দ্বারা রসুলপুর-নদীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু নৌকা যেমন বাহিরে আসিল, অমনি তথাকার প্রবলতর স্রোতে উত্তরমুখী হইয়া তীরবৎ বেগে চলিল, নাবিকেরা তাহার তিলার্দ্ধমাত্র সংযম করিতে পারিল না ; নৌকা আর ফিরিল না।

যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেকদূরে আসিয়াছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করা যাইবে কিনা, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা তাঁহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করা আর এক ভাঁটার কর্ম্ম। পরেরাত্রি আগত হইবে, আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। এ কাল পর্য্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে। দুইদিন অনাহারে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে। বিশেষ নাবিকেরা প্রতিগমন করিতে অসম্মত ; তাহারা কথার বাধ্য নহে। তাহারা বলিতেছে যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। তাহাই সম্ভব। তবে এত ক্লেশ-স্বীকার কি জন্য ?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।

ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাসনিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি পামর—এই যাত্রীদিগের ন্যায় পামর। (আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে---কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজনে

"——Like a veil,
Which, if withdrawn, would but disclos e the frown
Of one whose hate is mask'd but to assail.
Thus to their hopeless eyes the night was shown,
And grimly darkled o'er, the faces pale.

—Don Juan.

যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ করিয়া যাত্রীরা চলিয়া যান, তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়। পরন্তু যে সময়ের বর্ণনায় আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ে তথায় মনুষ্য বসতির কোন চিহ্ন ছিল না; অরণ্যময় মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যত্র ভূমি যেরূপ সচরাচর অনুদ্ঘাতিনী, এ প্রদেশে সেরূপ নহে। রসুলপুরের মুখ হইতে সুবর্ণরেখা পর্য্যন্ত অবাধে কয়েক যোজন পথ ব্যাপিত করিয়া এক বালুকাস্তূপশ্রেণী বিরাজিত আছে। আর কিছু উচ্চ হইলে ঐ বালুকাস্তূপশ্রেণীকে বালুকাময় ক্ষুদ্র পর্ব্বতশ্রেণী বলা যাইতে পারিত। এক্ষণে লোকে উহাকে বালিয়াড়ি বলে। ঐ সকল বালিয়াড়ির ধবল শিখরমালা মধ্যাহ্নসূর্য্যকিরণে দূর হইতে অপূর্ব্ব প্রভাবিশিষ্ট দেখায়। উহার উপর উচ্চ বৃক্ষ জন্মে না। স্তূপতলে সামান্য ক্ষুদ্র বন জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মধ্যদেশে বা শিরোভাগে প্রায়ই ছায়াশূন্য ধবলশোভা বিরাজ করিতে থাকে। অধোভাগমণ্ডনকারী বৃক্ষাদির মধ্যে ঝাটি, বন-ঝাউ এবং বনপুষ্পই অধিক।

এইরূপ অপ্রফুল্লকর স্থানে নবকুমার সঙ্গিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে কাষ্ঠভার লইয়া নদীতীরে আসিয়া নৌকা দেখিলেন না; তখন তাঁহার অকস্মাৎ অত্যন্ত ভয়সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু সঙ্গিগণ যে তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এমন বোধ হইল না। বিবেচনা করিলেন, জলোচ্ছ্বাসে সৈকতভূমি প্লাবিত হওয়ায় তাঁহারা নিকটস্থ অন্য কোন স্থানে নৌকা রক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্র তাঁহাকে সন্ধান করিয়া লইবেন, এই প্রত্যাশায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কিন্তু নৌকা আসিল না; নৌকারোহীও কেহ দেখা দিল না। নবকুমার ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, নৌকার সন্ধানে নদীর তীরে তীরে ফিরিতে লাগিলেন। কোথাও নৌকার সন্ধান পাইলেন না, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিলেন। তখন পর্য্যন্ত নৌকা না দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, জোয়ারের বেগে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এখন প্রতিকূল-স্রোতে প্রত্যাগমন করিতে সঙ্গীদিগের কাজে কাজেই বিলম্ব হইতেছে। কিন্তু জোয়ারও শেষ হইল। তখন ভাবিলেন, প্রতিকূল স্রোতের বেগাধিক্য বশতঃ জোয়ারে নৌকা ফিরিয়া আসিতে পারে নাই; এক্ষণে ভাঁটায় অবশ্য ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু ভাঁটাও ক্রমে অধিক হইল—

ক্রমে ক্রমে বেলাবসান হইয়া আসিল ; সূর্য্যাস্ত হইল। যদি নৌকা ফিরিয়া আসিবার হইত, তবে এক্ষণে ফিরিয়া আসিত।

তখন নবকুমারের প্রতীতি হইল যে, হয় জলোচ্ছ্বাসসম্ভূত তরঙ্গে নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে, নচেৎ সঙ্গিগণ তাঁহাকে এই বিজনে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

পর্ব্বততলচারী ব্যক্তির উপর শিখরখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে তাহাকে যেমন একেবারে নিষ্পেষিত করে, এ সিদ্ধান্ত জন্মমাত্র নবকুমারের হৃদয় সেইরূপ একেবারে নিষ্পেষিত হইল।

এ সময়ে নবকুমারের মনের অবস্থা যেরূপ হইল, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। সঙ্গিগণ প্রাণে নষ্ট হইয়া থাকিবে, এরূপ সন্দেহে পরিতাপযুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু আপনার বিপন্ন অবস্থার সমালোচনায় সে শোক শীঘ্র বিস্মৃত হইলেন। বিশেষ যখন মনে হইতে লাগিল যে, হয় ত সঙ্গীরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন ক্রোধের বেগে শোক দূর হইতে লাগিল।

নবকুমার দেখিলেন যে, গ্রাম নাই, আশ্রয় নাই, লোক নাই, আহার্য্য নাই, পেয় নাই ; নদীর জল অসহ্য লবণাত্মক ; অথচ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দুরন্ত শীতনিবারণ জন্য আশ্রয় নাই, গাত্রবস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল বায়ু-সঞ্চারিত নদীতীরে, হিমবর্ষী আকাশতলে নিরাশ্রয়ে, নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। হয় ত, রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্র-ভল্লুকে প্রাণনাশ করিবে। অদ্য না করে, কল্য করিবে। প্রাণনাশই নিশ্চিত।

মনের চাঞ্চল্যহেতু নবকুমার একস্থানে অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন ; ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল,—যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন ;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরল-কল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন, আর কদাচিৎ বন্যপশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে, শীতবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন উপত্যকায়, কখন স্তূপতলে, কখন অধিত্যকায়, কখন স্তূপ-শিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলে। চলিতে চলিতে প্রতিপদে হিংস্র পশু কর্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এক স্থানে বসিয়া থাকিলেও সেই আশঙ্কা।

ভ্রমণ করিতে করিতে নবকুমারের শ্রম জন্মিল। সমস্ত দিন অনাহার ; এ জন্য অধিক অবসন্ন হইলেন। এক স্থানে বালিয়াড়ির পার্শ্বে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া বসিলেন। গৃহের সুখতপ্ত শয্যা মনে পড়িল। যখন শারীরিক ও মানসিক ক্লেশের অবসাদে চিন্তা উপস্থিত হয়, তখন কখন কখন নিদ্রা আসিয়া সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয়। নবকুমার চিন্তা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলেন। বোধ হয়, যদি এরূপ নিয়ম না থাকিত, তবে সাংসারিক ক্লেশের অপ্রতিহত বেগ সকলে সকল সময়ে সহ্য করিতে পারিত না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্তুপ-শিখরে

"—সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।"

—মেঘনাদবধ।

যখন নবকুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন রজনী গভীরা। এখনও যে তাঁহাকে ব্যাঘ্রে হত্যা করে নাই, ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইল। ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন, ব্যাঘ্র আসিতেছে কি না। অকস্মাৎ সম্মুখে বহুদূরে, একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। পাছে ভ্রম জন্মিয়া থাকে, এ জন্য নবকুমার মনোভিনিবেশপূর্ব্বক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন! আলোক-পরিধি ক্রমে বর্দ্ধিতায়তন এবং উজ্জলতর হইতে লাগিল—আগ্নেয় আলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মাইল। প্রতীতিমাত্র নবকুমারের জীবন-আশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। মনুষ্যসমাগম ব্যতীত এ আলোকের উৎপত্তি সম্ভবে না। নবকুমার গাত্রোত্থান করিলেন; যথায় আলোক সেইদিকে ধাবিত হইলেন। একবার মনে ভাবিলেন, "এ আলোক ভৌতিক?—হইতেও পারে; কিন্তু শঙ্কায় নিরস্ত থাকিলেই কোন্ জীবনরক্ষা হয়?" এই ভাবিয়া নির্ভীকচিত্তে আলোক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। বৃক্ষ, লতা, বালুকাস্তুপ পদে পদে তাঁহার গতিরোধ করিতে লাগিল। বৃক্ষ-লতা দলিত করিয়া, বালুকাস্তুপ লঙ্ঘিত করিয়া নবকুমার চলিলেন। আলোকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন যে, এক অত্যুচ্চ বালুকাস্তুপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছে; তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশপটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছে। নবকুমার শিখরাসীন মনুষ্যের সমীপবর্ত্তী হইবেন, স্থিরসংকল্প করিয়া অশিথিলীভূতবেগে চলিলেন। পরিশেষে স্তুপারোহণ করিতে লাগিলেন। তখন কিঞ্চিৎ শঙ্কা হইতে লাগিল—তথাপি অকম্পিত-পদে স্তুপারোহণ করিতে লাগিলেন। আসীন ব্যক্তির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার রোমাঞ্চ হইল। তিষ্ঠিবেন কি প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

শিখরাসীন মনুষ্য নয়নমুদ্রিতকরিয়াধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাসবস্ত্র আছে কি না, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দূলচর্ম্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটাপরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে; তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে—চতুর্দ্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড

গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন কি স্থানত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদিগের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে এ ব্যক্তি দুরন্ত কাপালিক।

যখন নবকুমার উপনীত হইয়াছিলেন, তখন কাপালিক মন্ত্রসাধনে বা জপে বা ধ্যানে মগ্ন ছিল, নবকুমারকে দেখিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল "কস্ত্বম্?" নবকুমার কহিলেন, "ব্রাহ্মণ।"

কাপালিক কহিল, "তিষ্ঠ।" এই কহিয়া পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত হইল। নবকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এইরূপে প্রহরার্দ্ধ গত হইল। পরিশেষে কাপালিক গাত্রোত্থান করিয়া নবকুমারকে পূর্ব্ববৎ সংস্কৃতে কহিল, "মামনুসর।"

ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, অন্যসময়ে নবকুমার কদাপি ইহার সঙ্গী হইতেন না। কিন্তু এক্ষণে ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত; অতএব কহিলেন, "প্রভুর যেমত আজ্ঞা। কিন্তু আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় কাতর, কোথায় গেলে আহার্য্যসামগ্রী পাইব, অনুমতি করুন।"

কাপালিক কহিল, "তুমি ভৈরবীপ্রেরিত; আমার সঙ্গে আইস, আহার্য্য সামগ্রী পাইতে পারিবে।"

নবকুমার কাপালিকের অনুগামী হইলেন। উভয়ে অনেক পথ বাহিত করিলেন—পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। পরিশেষে এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইল, কাপালিক প্রথমে প্রবেশ করিয়া নবকুমারকে প্রবেশ করিতে অনুমতি করিল এবং নবকুমারের অবোধগম্য কোন উপায়ে এক খণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল। নবকুমার তদালোকে দেখিলেন যে, ঐ কুটীর সর্ব্বাংশে কিয়াপাতায় রচিত। তন্মধ্যে কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে—এক কলস জল ও কিছু ফল-মূল আছে।

কাপালিক অগ্নি জ্বালিত করিয়া কহিল, "ফল-মূল যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্য্যন্ত এ কুটীর ত্যাগ করিও না।"

এই বলিয়া কাপালিক প্রস্থান করিল। নবকুমার সেই সামান্য ফলমূল আহার করিয়া এবং সেই ঈষত্তিক্ত জল পান করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। পরে ব্যাঘ্রচর্ম্মে শয়ন করিলেন, সমস্ত দিবসজনিত ক্লেশহেতু শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমুদ্রতটে

"—যোগপ্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে।
বিভর্ষি চাকারমনির্ব্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্॥"
—রঘুবংশ।

প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটীগমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন; বিশেষ এ কাপালিকের সান্নিধ্য কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু আপাততঃ এ পথহীন বনমধ্য হইতে কি প্রকারে নিষ্ক্রান্ত হইবেন? কি প্রকারেই বা পথ চিনিয়া বাটি যাইবেন? কাপালিক অবশ্য পথ জানে; জিজ্ঞাসিলে কি পথ বলিয়া দিবে না? বিশেষ যতদূর দেখা গিয়াছে, ততদূর কাপালিক তাঁহার প্রতি কোন শঙ্কাসূচক আচরণ করে নাই—কেনই বা তবে তিনি ভীত হন? এ দিকে কাপালিক তাঁহাকে পুনঃসাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কুটীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে বরং তাহার রোষোৎপত্তির সম্ভাবনা। নবকুমার শ্রুত ছিলেন যে, কাপালিকেরা মন্ত্রবলে অসাধ্য-সাধনে সক্ষম। এ কারণে তাহার অবাধ্য হওয়া অনুচিত। ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া নবকুমার আপাততঃ কুটীরমধ্যে অবস্থান করাই স্থির করিলেন।

কিন্তু ক্রমে বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, তথাপি কাপালিক প্রত্যাগমন করিল না। পূর্ব্বদিনের উপবাস, অদ্য এ পর্য্যন্ত অনশন, ইহাতে ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিল। কুটীরমধ্যে যে অল্পপরিমাণ ফলমূল ছিল, তাহা পূর্ব্বরাত্রেই ভুক্ত হইয়াছিল—এক্ষণে কুটীর ত্যাগ করিয়া ফলমূলান্বেষণ না করিলে ক্ষুধায় প্রাণ যায়। অল্প বেলা থাকিতে ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।

নবকুমার ফলান্বেষণে নিকটস্থ বালুকাস্তূপসকলের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যে দুই একটা গাছ বালুকায় জন্মিয়া থাকে, তাহার ফলাস্বাদন করিয়া দেখিলেন যে, এক বৃক্ষের ফল বাদামের ন্যায় অতি সুস্বাদু; তদ্দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিলেন।

কথিত বালুকাস্তূপশ্রেণী প্রস্থে অতি অল্প, অতএব নবকুমার অল্পকাল ভ্রমণ করিয়া তাহা পার হইলেন। তৎপরে বালুকাবিহীন নিবিড় বনমধ্যে পড়িলেন। যাঁহারা ক্ষণকালজন্য অপূর্ব্বপরিচিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, পথহীন বনমধ্যে ক্ষণমধ্যেই পথভ্রান্তি জন্মে। নবকুমারের তাহাই ঘটিল। কিছু দূর আসিয়া আশ্রম কোন্ পথে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগরগর্জ্জন! ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র! উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা, স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা, হেমকান্ত সৈকত ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর

উপযুক্ত অলকাভরণ নীলজলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখনও এমন প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতিদূরে কোন ইউরোপীয় বণিক্‌জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল।

কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধিশোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তৎকালে তিনি পরিমাণ-বোধ-রহিত। পরে একেবারে প্রদোষ-তিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন কেন, তাহা বলিতে পারি না—তখন তাঁহার মনে কোন্ ভূতপূর্ব্ব সুখের উদয় হইতেছিল, তাহা কে বলিবে? গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদিবারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসংবদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্ফ-লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ, অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহু যুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমল শ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্ত্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।

নবকুমার অকস্মাৎ এইরূপ দুর্গমমধ্যে দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া নিস্পন্দশরীর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি রহিত হইল,—স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষলোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। উভয়মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।

অনন্তর সমুদ্রের জনহীন তীরে, এইরূপে বহুক্ষণ দুই জনে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে তরুণীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। তিনি অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?"

এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না, কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূতস্বরে সংশোধিত হইয়া

যায় ; সকলই লয়বিশিষ্ট হয়, সংসারযাত্রা সেই অবধি সুখময় সঙ্গীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়।) নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।

"পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ ?" এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল ; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল ; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল ; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দর ; রমণী সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দরী ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় উঠিতে লাগিল।

রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, "আইস।" এই বলিয়া তরুণী চলিল, পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে অলক্ষ্যপাদবিক্ষেপে চলিল ; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। এক স্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে ; বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কাপালিকসঙ্গে

"কথং নিগড়সংযতাসি দ্রুতম্
নয়ামি ভবতীমিতঃ—"

—রত্নাবলী।

নবকুমার কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারসংযোজন পূর্ব্বক করতলে মস্তক দিয়া বসিলেন ; শীঘ্র আর মস্তকোত্তোলন করিলেন না।

"এ কি দেবী—মানুষী—না কাপালিকের মায়ামাত্র !" নবকুমার নিস্পন্দ হইয়া হৃদয়মধ্যে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অন্যমনস্ক ছিলেন বলিয়া, নবকুমার আর একটি ব্যাপার দেখিতে পান নাই। সেই কুটীর মধ্যে তাঁহার আগমনপূর্ব্বাবধি একখানি কাষ্ঠ জ্বলিতেছিল। পরে যখন অনেক রাত্রে স্মরণ হইল যে, সায়াহ্নকৃত্য অসমাপ্ত রহিয়াছে—তখন জলান্বেষণ অনুরোধে চিন্তা হইতে ক্ষান্ত হইয়া এ বিষয়ের অসম্ভাবিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। শুধু আলো নহে, তণ্ডুলাদি পাকোপযোগী কিছু কিছু সামগ্রীও আছে। নবকুমার বিস্মিত হইলেন না—মনে করিলেন যে, এও কাপালিকের কর্ম্ম—এ স্থানে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে।

"শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্" মন্দ কথা নহে। "ভোজ্যঞ্চ উদরাগতম্" বলিলে আরও স্পষ্ট হয়। নবকুমার এ কথার মাহাত্ম্য না বুঝিতেন, এমন নহে। সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে তণ্ডুলগুলি কুটীরমধ্যে প্রাপ্ত এক মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিয়া আত্মসাৎ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে চর্ম্মশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই সমুদ্রতীরাভিমুখে চলিলেন।

পূর্ব্বদিনের যাতায়াতের গুণে অত্য অল্প কষ্টে পথ অনুভূত করিতে পারিলেন। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন? পূর্ব্বদৃষ্টা মায়াবিনী পুনর্ব্বার সে স্থলে যে আসিবেন—এমত আশা নবকুমারের হৃদয়ে কতদূর প্রবল হইয়াছিল, বলিতে পারি না—কিন্তু সে স্থান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। অনেক বেলাতেও তথায় কেহ আসিল না। তখন নবকুমার সে স্থানের চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বৃথা অন্বেষণ মাত্র। মনুষ্যসমাগমের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। সূর্য্য অস্তগত হইল; অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল; নবকুমার হতাশ হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন। সায়াহ্নকালে সমুদ্রতীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নবকুমার দেখিলেন যে, কাপালিক কুটিরমধ্যে ধরাতলে উপবেশন করিয়া নিঃশব্দে আছে। নবকুমার প্রথমে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে কাপালিক কোন উত্তর করিলেন না।

নবকুমার কহিলেন, "এ পর্য্যন্ত প্রভুর দর্শনে কি জন্য বঞ্চিত ছিলাম?" কাপালিক কহিল, "নিজ ব্রতে নিযুক্ত ছিলাম।"

নবকুমার গৃহগমনাভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। কহিলেন, "পথ অবগত নহি—পাথেয় নাই। যদ্বিহিতবিধান প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ হইলে হইতে পারিবে, এই ভরসায় আছি।

কাপালিক কেবলমাত্র কহিল, "আমার সঙ্গে আগমন কর।" এই বলিয়া উদাসীন গাত্রোত্থান করিলেন। বাটী যাইবার কোন সদুপায় হইতে পারিবে, প্রত্যাশায় নবকুমারও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

তখন সন্ধ্যালোক অন্তর্হিত হয় নাই—কাপালিক অগ্রে অগ্রে, নবকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ নবকুমারের পৃষ্ঠদেশে কাহার কোমল করস্পর্শ হইল। পশ্চাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্পন্দহীন হইলেন। সেই আগুল্‌ফলম্বিত নিবিড়-কেশরাশিধারিণী বন্যদেবীমূর্ত্তি। পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ, নিস্পন্দ। কোথা হইতে এ মূর্ত্তি অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাতে আসিল! নবকুমার দেখিলেন, রমণী মুখে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া আছে। নবকুমার বুঝিলেন যে, রমণী বাক্যস্ফূর্ত্তি নিষেধ করিতেছে। নিষেধের বড় প্রয়োজনও ছিল না। নবকুমার কি কথা কহিবেন? তিনি তথায় চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। কাপালিক এ সকল কিছুই দেখিতে পাইল না, অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা উদাসীনের শ্রবণাতিক্রান্ত হইলে রমণী মৃদুস্বরে কি কথা কহিল। নবকুমারের কর্ণে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।"

এই কথা সমাপ্ত করিয়াই উক্তিকারিণী সরিয়া গেলেন, প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য তিষ্ঠিলেন না। নবকুমার কিয়ৎকাল অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইলেন, পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু রমণী কোন্ দিকে গেল, তাহার কিছুই স্থিরতা পাইলেন না। মনে করিতে লাগিলেন, "এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে? যে কথা শুনিলাম—সে ত আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা? তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে। তবে কি পলাইব? কোথায় পলাইবার স্থান আছে?"

নবকুমার এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, কাপালিক তাঁহাকে সঙ্গে না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। কাপালিক কহিল, "বিলম্ব করিতেছ কেন ?"

যখন লোকে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারে, তখন তাহাদিগকে যে দিকে প্রথম আহূত করা যায়, সেই দিকেই প্রবৃত্ত হয়। কাপালিক পুনরাহ্বান করাতে বিনাবাক্য-ব্যয়ে নবকুমার তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে এক মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট কুটীর দেখিতে পাইলেন। তাহাকে কুটীরও বলা যাইতে পারে, ক্ষুদ্র গৃহও বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে আমাদিগের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার পশ্চাতেই সিকতাময় সমুদ্রতীর। গৃহপার্শ্ব দিয়া কাপালিক নবকুমারকে সেই সৈকতে লইয়া চলিলেন ; এমন সময় তীরের তুল্য বেগে পূর্ব্বদৃষ্টা রমণী তাঁহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। গমনকালে তাঁহার কর্ণে বলিয়া গেল, "এখনও পলাও। নরমাংস নহিলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না, তুমি কি জান না ?"

নবকুমারের কপালে স্বেদনির্গম হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবতীর এই কথা কাপালিকের কর্ণে গেল। সে কহিল, "কপালকুণ্ডলে !"

স্বর নবকুমারের কর্ণে মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না।

কাপালিক নবকুমারের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মানুষঘাতী করস্পর্শে নবকুমারের শোণিত ধমনীমধ্যে শতগুণ বেগে প্রধাবিত হইল—লুপ্ত সাহস পুনর্ব্বার আসিল। কহিলেন, "হস্ত ত্যাগ করুন।"

কাপালিক উত্তর করিল না। নবকুমার পুনরপি জিজ্ঞাসা করিবেন, "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?"

কাপালিক কহিল "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিলেন, "কেন ?"

কাপালিক কহিল, "বধার্থ।"

অতি তীব্রবেগে নবকুমার নিজ হস্ত টানিলেন। যে বলে তিনি হস্ত আকর্ষিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সামান্য লোকে তাঁহার হাত ধরিয়া থাকিলে, হস্তরক্ষা করা দূরে থাকুক,—বেগে ভূপতিত হইত। কিন্তু কাপালিকের অঙ্গমাত্র হেলিল না ; নবকুমারের প্রকোষ্ঠ তাহার হস্তমধ্যেই রহিল। নবকুমারের অস্থিগ্রন্থিসকল যেন ভগ্ন হইয়া গেল। মুমূর্ষুর ন্যায় নবকুমার কাপালিকের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সৈকতের মধ্যস্থানে নীত হইয়া নবকুমার দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের ন্যায় তথায় বৃহৎ কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছে। চতুষ্পার্শ্বে তান্ত্রিকপূজার আয়োজন রহিয়াছে। তন্মধ্যে নরকপালপূর্ণ আসব রহিয়াছে—কিন্তু শব নাই। অনুমান করিলেন, তাঁহাকেই শব হইতে হইবে।

কতকগুলি শুষ্ক, কঠিন লতাগুল্ম তথায় পূর্ব্ব হইতেই আহরিত ছিল। কাপালিক তদ্দ্বারা নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। নবকুমার সাধ্যমত বলপ্রকাশ করিলেন ; কিন্তু বলপ্রকাশ কিছুমাত্র ফলদায়ক হইল না। তাঁহার প্রতীতি হইল যে, এ

বয়সেও কাপালিক মত্তহস্তীর বল ধারণ করে। নবকুমারের বলপ্রকাশ দেখিয়া কাপালিক কহিল "মূর্খ! কি জন্য বলপ্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবে। ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?"

কাপালিক নবকুমারকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া সৈকতোপরি ফেলিয়া রাখিলেন এবং বধের প্রাক্কালিক পূজাদি ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইলেন। ততক্ষণ নবকুমার বাঁধন ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু শুষ্ক লতা অতি কঠিন—বন্ধন অতি দৃঢ়। মৃত্যু আসন্ন! নবকুমার ইষ্টদেবচরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন। একবার জন্মভূমিকে মনে পড়িল, নিজ সুখের আলয় মনে পড়িল, একবার বহুদিন অন্তর্হিত জনক এবং জননীর মুখ মনে পড়িল, দুই এক বিন্দু অশ্রুজল সৈকত-বালুকায় শুষিয়া গেল। কাপালিক বলির প্রাক্কালিক ক্রিয়া সমাপনান্তে বধার্থ খড়্গ লইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। কিন্তু যথায় খড়্গ রাখিয়াছিল, তথায় খড়্গ পাইল না। আশ্চর্য্য! কাপালিক কিছু বিস্মিত হইল। তাহার নিশ্চিত মনে হইতেছিল যে, অপরাহ্ণে খড়্গ আনিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছিল এবং স্থানান্তরও করে নাই, তবে খড়্গ কোথায় গেল? কাপালিক ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিল, কোথাও পাইল না। তখন পূর্ব্বকথিত কুটীরাভিমুখ হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিল, কিন্তু পুনঃ পুনঃ ডাকাতেও কপালকুণ্ডলা কোন উত্তর দিল না। তখন কাপালিকের চক্ষু লোহিত, ভ্রূযুগ আকুঞ্চিত হইল। দ্রুত-পদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিল; এই অবকাশে বন্ধনলতা ছিন্ন করিতে নবকুমার আর একবার যত্ন পাইলেন—কিন্তু সে যত্নও নিষ্ফল হইল।

এমন সময়ে নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এই পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। তাহার করে খড়্গ দুলিতেছে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "চুপ! কথা কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতি শীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমেষের মধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, "পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন; নবকুমার লম্ফদান করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অন্বেষণে

"And the great lord of Luna,
Fell at that deadly stroke ;
As falls on mount Alvernus,
A thunder smitten oak."

—Lays of Ancient Rome

এ দিকে কাপালিক গৃহমধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া, না খড়্গ না কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইয়া, সন্দিগ্ধচিত্তে সৈকতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথায় আসিয়া দেখিল যে, নবকুমার তথায় নাই। ইহাতে অত্যন্ত বিস্ময় জন্মিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই ছিন্ন লতাবন্ধনের উপর দৃষ্টি পড়িল। তখন স্বরূপ অনুভূতি করিতে পারিয়া কাপালিক নবকুমারের অন্বেষণে বাহির হইল ; কিন্তু বিজনমধ্যে পলাতকেরা কোন্ দিকে কোন্ পথে গিয়াছে, তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। অন্ধকারবশতঃ কাহাকেও দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিতে পারিল না। এ জন্য বাক্যশব্দ লক্ষ্য করিয়া ক্ষণেক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু সকল সময়ে কণ্ঠধ্বনিও শুনিতে পাওয়া গেল না। অতএব বিশেষ করিয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে এক উচ্চ বালিয়াড়ির শিখরে উঠিল। কাপালিক এক পার্শ্ব দিয়া উঠিল ; তাহার অন্যতম পার্শ্বে বর্ষার জলপ্রবাহে স্তূপমূল ক্ষয়িত হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না ; শিখরে আরোহণ করিবামাত্র কাপালিকের শরীরভরে সেই পতনোন্মুখ স্তূপশিখর ভগ্ন হইয়া অতি ঘোর-রবে ভূপতিত হইল। পতনকালে পর্ব্বত শিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আশ্রয়ে

"And that very night—
Shall Romeo bear thee to Mantua."

—Romeo and Juliet.

সেই অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার যামিনীতে দুইজনে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বনপথ নবকুমারের অপরিজ্ঞাত ; কেবল সহচারিণী ষোড়শীকে লক্ষ্য করিয়া তদনুসংবর্ত্তী হওয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য উপায় নাই। কিন্তু অন্ধকারে বনমধ্যে রমণীকে সকল সময়ে দেখা যায় না, যুবতী একদিকে ধাবমানা হইলে, নবকুমার অন্য দিকে যান। রমণী কহিলেন, "আমার অঞ্চল ধর।" নবকুমার তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া চলিলেন। ক্রমে

তাঁহারা পদক্ষেপ মন্দ করিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখন কোথায় নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়, কোথাও খদ্যোতমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।

কপালকুণ্ডলা পথিককে সমভিব্যাহারে লইয়া নিভৃত কাননাভ্যন্তরে উপনীত হইলেন; তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সম্মুখে অন্ধকারে বনমধ্যে এক অত্যুচ্চ দেবালয়চূড়া লক্ষিত হইল; তন্নিকটে ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত একটি গৃহও দেখা গেল। কপালকুণ্ডলা প্রাচীরদ্বারের নিকটস্থ হইয়া তাহাতে করাঘাত করিতে লাগিলেন; পুনঃপুনঃ করাঘাত করাতে ভিতর হইতে এক ব্যক্তি কহিল, "কে ও, কপালকুণ্ডলা বুঝি?" কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দ্বার খোল।"

উত্তরকারী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যে ব্যক্তি দ্বার খুলিয়া দিল, সে ঐ দেবলয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবক বা অধিকারী; বয়সে পঞ্চাশৎ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাঁহার বিরলকেশ মস্তক কর দ্বারা আকর্ষিত করিয়া আপন অধরের নিকট তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় আনিলেন এবং দুই চারি কথায় নিজ সঙ্গীর অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন।

অধিকারী বহুক্ষণ পর্য্যন্ত করতললগ্নশীর্ষ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কহিলেন, "এ বড় বিষম ব্যাপার! মহাপুরুষ মনে করিলে সকল করিতে পারেন। যাহা হউক, মায়ের প্রসাদে তোমার অমঙ্গল ঘটিবে না। সে ব্যক্তি কোথায়?"

কপালকুণ্ডলা, "আইস" বলিয়া নবকুমারকে আহ্বান করিলেন। নবকুমার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিলেন, আহূত হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অধিকারী তাঁহাকে কহিলেন, "আজি এইখানে লুকাইয়া থাক, কালি প্রত্যুষে তোমাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।"

ক্রমে কথায় কথায় অধিকারী জানিতে পারিলেন যে, এ পর্য্যন্ত নবকুমারের আহারাদি হয় নাই। উহাতে অধিকারী তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নবকুমার আহারে নিতান্ত অস্বীকৃত হইয়া কেবলমাত্র বিশ্রাম-স্থানের প্রার্থনা জানাইলেন। অধিকারী নিজ রন্ধনশালায় নবকুমারের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। অধিকারী তাঁহার প্রতি সস্নেহনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাইও না। ক্ষনেক দাঁড়াও, এক ভিক্ষা আছে।"

কপালকুণ্ডলা। কি?

অধিকারী। তোমাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবে না?

কপা। করিব না।

অধি। আমার এই ভিক্ষা, তুমি আর সেখানে ফিরিয়া যাইও না।

কপা। কেন?

অধি। গেলে তোমার রক্ষা নাই।

কপা। তাহা ত জানি।

অধি। তবে আর জিজ্ঞাসা কর কেন?

কপা। না গিয়া কোথায় যাইব?

অধি। এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।

কপালকুণ্ডলা নীরব হইয়া রহিলেন। অধিকারী কহিলেন, "মা, কি ভাবিতেছ?"

কপা। যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবা পুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত; এখন যাইতে বল কেন?

অধি। তখন তোমার জীবনের আশঙ্কা করি নাই, বিশেষ যে সদুপায়ের সম্ভাবনা ছিল, এখন সে সদুপায় হইতে পারিবে। আইস, মায়ের অনুমতি লইয়া আসি।

এই বলিয়া অধিকারী দীপহস্তে দেবালয়ের দ্বারে গিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। কপালকুণ্ডলাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। মন্দিরমধ্যে মানবাকার-পরিমিতা করাল-কালীমূর্ত্তি সংস্থাপিতা ছিল। উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। অধিকারী আচমন করিয়া পুষ্পপাত্র হইতে একটি অচ্ছিন্ন বিল্বপত্র লইয়া মন্ত্রপূত করিলেন এবং তাহা প্রতিমার পাদোপরি সংস্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন "মা, দেখ, দেবী অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছেন, বিল্বপত্র পড়ে নাই, যে মানস করিয়া অর্ঘ্য দিয়াছিলাম, তাহাতে অবশ্য মঙ্গল। তুমি এই পথিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে গমন কর। কিন্তু আমি বিষয়ী লোকের রীতি-চরিত্র জানি। তুমি যদি গলগ্রহ হইয়া ইহার সঙ্গে যাও, তবে এ ব্যক্তি অপরিচিত যুবতী সঙ্গে লইয়া লোকালয়ে লজ্জা পাইবে; তোমাকেও লোকে ঘৃণা করিবে। তুমি বলিতেছ, এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণসন্তান; গলাতেও যজ্ঞোপবীত দেখিতেছি। এ যদি তোমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যায়, তবে সকল মঙ্গল। নচেৎ আমিও তোমাকে যাইতে বলিতে পারি না।"

"বি—বা—হ।" এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, "বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?"

অধিকারী ঈষন্মাত্র হাস্য করিয়া কহিলেন, "বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্ম্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।"

অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, সকলই বুঝিলেন। বলিলেন "তাহাই হউক! কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এত দিন প্রতিপালন করিয়াছেন।"

অধি। কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না। স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ না করিলে যে তান্ত্রিক সিদ্ধ হয় না, তাহা তুমি জান না। আমিও তন্ত্রাদি পাঠ করিয়াছি। মা জগদম্বা জগতের মাতা। ইনি সতীর সতীত্ব—সতীর প্রধানা। ইনি সতীত্বনাশ-সংযুক্ত পূজা কখনও গ্রহণ করেন না। এই জন্যই আমি মহাপুরুষের অনভিমত সাধিতেছি। তুমি পলায়ন করিলে কদাপি কৃতঘ্ন হইবে না। কেবল এ পর্য্যন্ত সিদ্ধির সময় উপস্থিত হয় নাই বলিয়া তুমি রক্ষা পাইয়াছ। আজ তুমি

যে কার্য্য করিয়াছ—তাহাতে প্রাণেরও আশঙ্কা। এই জন্য বলিতেছি, পলায়ন কর। ভবানীরও এই আজ্ঞা। অতএব যাও। আমার এখানে রাখিবার উপায় থাকিলে রাখিতাম; কিন্তু সে ভরসা নাই, তাহা ত জান।

কপা। বিবাহই হউক।

এই বলিয়া উভয়ে মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। এক কক্ষমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বসাইয়া অধিকারী নবকুমারের শয্যা-সন্নিধানে গিয়া তাঁহার শিয়রে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! নিদ্রিত কি?"

নবকুমারের নিদ্রা যাইবার অবস্থা নহে, নিজদশা ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, "আজ্ঞে না।"

অধিকারী বলিলেন, "মহা- ; পরিচয়টা লইতে একবার আসিলাম। আপনি ব্রাহ্মণ?"

নব। আজ্ঞে হাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীয় শ্রেণী।

অধি। আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—উৎকলব্রাহ্মণ বিবেচনা করিবেন না। বংশে কুলাচার্য্য, তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্ম্মা।

অধি। নিবাস?

নব। সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন গাঁই?

নব। বন্দ্যঘটী।

অধি। কয় সংসার করিয়াছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

নবকুমার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এক সংসারও ছিল না। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে রহিলেন; মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাতায়াত করিতেন। যখন তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তমদর্শনে গিয়াছিলেন। এই সময়ে পাঠানেরা আকবর শাহ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে দূরীভূত হইয়া উড়িষ্যায় সদলে বসতি করিতেছিল। তাহাদিগের দমনের জন্য আকবর শাহ বিধিমতে যত্ন পাইতে লাগিলেন। যখন রামগোবিন্দ ঘোষাল উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করেন, তখন মোগল পাঠানের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। আগমনকালে তিনি পথিমধ্যে পাঠান-সেনার হস্তে পতিত হয়েন। পাঠানেরা তৎকালে ভদ্রাভদ্র-বিচারশূন্য। তাহারা নিরপরাধী পথিকের প্রতি অর্থের জন্য বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। রামগোবিন্দ কিছু উগ্রস্বভাব, পাঠানদিগকে কটু কহিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে, সপরিবারে অবরুদ্ধ হইলেন; পরিশেষে জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সপরিবারে মুসলমান হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

অধি। ভাল। কিন্তু যখন আপনার আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞাসা করিবে যে, এ কাহার স্ত্রী, কি উত্তর দিবেন ?

নবকুমার পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আপনিই ইহার পরিচয় আমাকে দিন। আমি সেই পরিচয় সকলকে দিব।"

অধি। ভাল। কিন্তু এই পক্ষান্তরের পথ যুবক-যুবতী অনন্যসহায় হইয়া কি প্রকারে যাইবে ? লোকে দেখিয়া শুনিয়া কি বলিবে ? আত্মীয়-স্বজনের নিকট কি বুঝাইবে ? আর আমিও এই কন্যাকে মা বলিয়াছি, আমিই বা কি প্রকারে ইহাকে অজ্ঞাতচরিত্র যুবার সহিত একাকী দূরদেশে পাঠাইয়া দিই ?

ঘটকরাজ ঘটকালীতে মন্দ নহেন।

নবকুমার কহিলেন, "আপনি সঙ্গে আসুন।"

অধি। আমি সঙ্গে যাইব ? ভবানীর পূজা কে করিবে ?

নবকুমার ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তবে কি কোন উপায় করিতে পারেন না ?"

অধি। একমাত্র উপায় হইতে পারে,—সে আপনার ঔদার্য্যগুণের অপেক্ষা করে।

নব। সে কি ? আমি কিসে অস্বীকৃত ? কি উপায় বলুন ?

অধি। শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাহাদিগের দ্বারা কালে এই সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইঁহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধি-মানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্য্যন্ত অনূঢ়া ; ইহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।

নবকুমার শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। অতি দ্রুতপদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। অধিকারী কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, "আপনি এক্ষণে নিদ্রা যান। কল্য প্রত্যুষে আপনাকে আমি জাগরিত করিব। ইচ্ছা হয়, একাকী যাইবেন। আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।

এই বলিয়া অধিকারী বিদায় হইলেন ; গমনকালে মনে মনে কহিলেন, "রাঢ়দেশের ঘটকালি কি ভুলিয়া গিয়াছি না কি ?"

নবম পরিচ্ছেদ

দেবনিকেতনে

"কণ্ব। অলং রুদিতেন, স্থিরা ভব, ইতঃ পন্থানমালোকয়।"

—শকুন্তলা।

প্রাতে অধিকারী নবকুমারের নিকট আসিলেন। দেখিলেন, এখনও নবকুমার শয়ন করেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি কর্তব্য ?"

৩

রামগোবিন্দ ঘোষাল সপরিবারে প্রাণ লইয়া বাটী আসিলেন বটে, কিন্তু মুসলমান বলিয়া আত্মীয়জনসমাজে এককালীন পরিত্যক্ত হইলেন। এ সময়ে নবকুমারের পিতা বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সহিত জাতিভ্রষ্টা পুত্রবধূকে ত্যাগ করিতে হইল। আর নবকুমারের সহিত তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাৎ হইল না।

স্বজনত্যক্ত ও সমাজচ্যুত হইয়া রামগোবিন্দ ঘোষাল অধিক দিন স্বদেশে বাস করিতে পারিলেন না। এই কারণেও বটে, এবং রাজপ্রাসাদে উচ্চ পদস্থ হইবার আকাঙ্ক্ষায়ও বটে, তিনি সপরিবারে রাজমহলে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তিনি সপরিবারে মহম্মদীয় নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজমহলে যাওয়ার পরে শ্বশুরের বা বনিতার কি অবস্থা হইল, তাহা নবকুমারের জানিতে পারিবার কোন উপায় রহিল না এবং এ পর্য্যন্ত কখন কিছু জানিতেও পারিলেন না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দার পরিগ্রহ করিলেন না। এই জন্য বলিতেছি, নবকুমারের "এক সংসারও নহে।"

অধিকারী এ সকল বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না তিনি বিবেচনা করিলেন, "কুলীনের সন্তানের দুই সংসারে আপত্তি কি?" প্রকাশ্যে কহিলেন, "আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম। এই যে কন্যা আপনার প্রাণরক্ষা করিয়াছে—এ পরহিতার্থ আত্মপ্রাণ নষ্ট করিয়াছে। যে মহাপুরুষের আশ্রয়ে ইহার বাস, তিনি অতি ভয়ঙ্কর-স্বভাব। তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে আপনার যে দশা ঘটিতেছিল, ইহার সেই দশা ঘটিবে। ইহার কোন উপায় বিবেচনা করিতে পারেন কি না?"

নবকুমার উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "আমিও সেই আশঙ্কা করিতেছিলাম। আপনি সকল অবগত আছেন, ইহার উপায় করুন। আমার প্রাণদান করিলে যদি কোন প্রত্যুপকার হয়,—তবে তাহাতেও প্রস্তুত আছি। আমি এমন সঙ্কল্প করিতেছি যে, আমি সেই নরঘাতকের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া আত্মসমর্পণ করি। তাহা হইলে ইহার রক্ষা হইবে।" অধিকারী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি বাতুল। ইহাতে কি ফল দর্শিবে? তোমারও প্রাণসংহার হইবে—অথচ ইহার প্রতি মহাপুরুষের ক্রোধোপশম হইবে না। ইহার একমাত্র উপায় আছে।"

নব। সে কি উপায়?

অধি। আপনার সহিত ইহার পলায়ন। কিন্তু সে অতি দুর্ঘট। আমার এখানে থাকিলে দুই একদিনের মধ্যে ধৃত হইবে। এ দেবালয়ে মহাপুরুষের সর্ব্বদা যাতায়াত। সুতরাং কপালকুণ্ডলার অদৃষ্টে অশুভ দেখিতেছি।

নবকুমার আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত পলায়ন দুর্ঘট কেন?"

অধি। এ কাহার কন্যা,—কোন্ কুলে জন্ম, তাহা আপনি কিছুই জানেন না। কাহার পত্নী,—কি চরিত্রা, তাহা কিছুই জানেন না। আপনি ইহাকে কি সঙ্গিনী করিবেন? সঙ্গিনী করিয়া লইয়া গেলেও কি আপনি ইহাকে নিজ গৃহে স্থান দিবেন? আর যদি স্থান না দেন, তবে এ অনাথা কোথায় যাইবে?

নবকুমার ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য্য আমার অসাধ্য নহে। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থা হইয়া থাকিবেন।"

নবকুমার কহিলেন, "আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্ম্মপত্নী ; ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব। কে কন্যা সম্প্রদান করিবে ?"

ঘটকচূড়ামণির মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। মনে মনে ভাবিলেন, "এত দিনে জগদম্বার কৃপায় আমার কপালিনীর বুঝি গতি হইল।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি সম্প্রদান করিব।" অধিকারী নিজ শয়নকক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। একটি খুঙ্গীর মধ্যে কয়েকখণ্ড অতি জীর্ণ তালপত্র ছিল ; তাহাতে তাঁহার তিথিনক্ষত্রাদি নির্দ্দিষ্ট থাকিত। তৎসমুদয় সবিশেষ সমালোচনা করিয়া আসিয়া কহিলেন, "আজি যদিও বৈবাহিক দিন নহে—তথাপি বিবাহে কোন বিঘ্ন নাই। গোধূলিলগ্নে কন্যা সম্প্রদান করিব। তুমি অদ্য উপবাস করিয়া থাকিবে মাত্র, কৌলিক আচরণ সকল বাটী গিয়া করাইও। এক দিনের জন্য তোমাদিগকে লুকাইয়া রাখিতে পারি, এমন স্থান আছে। আজি যদি তিনি আসেন, তবে তোমাদিগের সন্ধান পাইবেন না। পরে বিবাহান্তে কালি প্রাতে সপত্নীক বাটী যাইও।"

নবকুমার ইহাতে সম্মত হইলেন ; এ অবস্থায় যতদূর সম্ভবে ততদূর যথাশাস্ত্র কার্য্য হইল। গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

কাপালিকের কোন সংবাদ নাই। পরদিন প্রত্যূষে তিনজনে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অধিকারী মেদিনীপুরের পথ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে রাখিয়া আসিবেন।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা কালী-প্রণামার্থ গেলেন। ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে একটি অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা। বিল্বদল প্রতিমাচরণচ্যুত হইল দেখিয়া ভীত হইলেন ;—এবং অধিকারীকে সংবাদ দিলেন। অধিকারীও বিষণ্ণ হইলেন ; কহিলেন, "এখন নিরুপায়। এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

সকলে নিঃশব্দে চলিলেন। অনেক বেলা হইলে মেদিনীপুরের পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অধিকারী বিদায় হইলেন। কপালকুণ্ডলা কাঁদিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে যে জন তাঁহার একমাত্র সুহৃদ্, সে বিদায় হইতেছে।

অধিকারীও কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষের জল মুছিয়া কপালকুণ্ডলার কানে কানে কহিলেন "মা! তুই জানিস্, পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোট বড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পাল্কী করিয়া দিতে বলিস্। সন্তান বলিয়া মনে করিস্।"

অধিকারী এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেলেন। কপালকুণ্ডলাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাজপথে

"———There—now lean on me;
Place your foot here———"

—Manfred.

কোন লেখক বলিয়াছেন, "মনুষ্যের জীবন কাব্যবিশেষ।" কপালকুণ্ডলার জীবন-কাব্যের এক সর্গ সমাপ্ত হইল। পরে কি হইবে?

নবকুমার মেদিনীপুরে আসিয়া অধিকারীর প্রদত্ত ধনবলে কপালকুণ্ডলার জন্য এক জন দাসী, এক জন রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন। অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতু স্বয়ং পদব্রজে চলিলেন। নবকুমার পূর্ব্বদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, মধ্যাহ্নভোজনের পর বাহকেরা তাঁহাকে অনেক পশ্চাৎ করিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শীতকালের অনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে। সন্ধ্যাও অতীত হইল। পৃথিবী অন্ধকারময়ী হইল। অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলার সহিত একত্র হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। মনে মনে স্থির-জ্ঞান ছিল যে, প্রথম সরাইতে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন, কিন্তু সরাইও আপাততঃ দেখা যায় না। প্রায় রাত্রি চারি ছয় দণ্ড হইল। নবকুমার দ্রুতপাদবিক্ষেপ করিতে করিতে চলিলেন। অকস্মাৎ কোন কঠিন দ্রব্যে তাঁহার চরণ-স্পর্শ হইলে পদভরে সে বস্তু খড়-খড় মড়-মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। নবকুমার দাঁড়াইলেন, পুনর্ব্বার পদচালনা করিলেন, পুনর্ব্বার ঐরূপ হইল। পদস্পৃষ্ট বস্তু হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন, ঐ বস্তু তক্তাভাঙ্গার মত।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সচরাচর এমন অন্ধকার হয় না, অনাবৃত স্থানে স্থূল বস্তুর অবয়ব লক্ষ্য হয় না। সম্মুখে একটা বৃহৎ বস্তু পড়িয়াছিল; নবকুমার অনুভব করিয়া দেখিলেন যে, সে ভগ্ন শিবিকা; অমনি তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার বিপদ আশঙ্কা হইল। শিবিকার দিকে যাইতে আবার ভিন্নপ্রকার পদার্থে তাঁহার পদস্পর্শ হইল। এ স্পর্শ কোমল মনুষ্যশরীরস্পর্শের ন্যায় বোধ হইল। বসিয়া হাত বুলাইয়া দেখিলেন, মনুষ্যশরীর বটে। স্পর্শ অত্যন্ত শীতল, তৎসঙ্গে দ্রবপদার্থের স্পর্শ অনুভূত হইল। নাড়ীতে হাত দিয়া দেখিলেন, স্পন্দন নাই, প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। বিশেষ মনঃসংযোগ করিয়া দেখিলেন, যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। নিশ্বাস আছে, তবে নাড়ী নাই কেন? এ কি রোগী? নাসিকার নিকট হাত দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস বহিতেছে না। তবে শব্দ কেন? হয় ত

কোন জীবিত ব্যক্তিও এখানে আছে, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কেহ জীবিত ব্যক্তি আছে ?"

মৃদুস্বরে এক উত্তর হইল, "আছি।"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি ?"

উত্তর হইল, "তুমি কে ?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রীকণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কপালকুণ্ডলা নাকি ?"

স্ত্রীলোক কহিল, "কপালকুণ্ডলা কে, তা জানি না—আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।"

ব্যঙ্গ শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন "কি হইয়াছে ?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, আমার এক বাহককে মারিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে। দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

নবকুমার অন্ধকারে অনুধাবন করিয়া দেখিলেন, যথার্থই একটি স্ত্রীলোক শিবিকাতে বস্ত্র দ্বারা দৃঢ়তর বন্ধনযুক্ত আছে। নবকুমার শীঘ্রহস্তে তাহার বন্ধন মোচন করিয়া কহিলেন, "তুমি উঠিতে পারিবে কি ?" স্ত্রীলোক কহিল, "আমাকেও এক ঘা লাঠি লাগিয়াছিল, এ জন্য পায়ে বেদনা আছে, কিন্তু বোধ হয় অল্প সাহায্য করিলে উঠিতে পারিব।"

নবকুমার হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। রমণী তৎ-সাহায্যে গাত্রোত্থান করিলেন। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "চলিতে পারিবে কি ?"

স্ত্রীলোক উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার পশ্চাতে কেহ পথিক আসিতেছে দেখিয়াছেন ?"

নবকুমার কহিলেন, "না।"

স্ত্রীলোক পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "চটি কত দূর ?"

নবকুমার কহিলেন, "কত দূর বলিতে পারি না—কিন্তু বোধ হয় নিকট।"

স্ত্রীলোক কহিল, "অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বসিয়া কি করিব, আপনার সঙ্গে চটি পর্য্যন্ত যাওয়াই উচিত। বোধ হয় কোন কিছুর উপর ভর করিতে পারিলে চলিতে পারিব।"

নবকুমার কহিলেন, "বিপৎকালে সঙ্কোচ মূঢ়ের কাজ। আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।"

স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য্য করিল না। নবকুমারের স্কন্ধেই ভর করিয়া চলিল।

যথার্থই চটি নিকটে ছিল। এ সকল কালে চটির নিকটেও দুষ্ক্রিয়া করিতে দস্যুরা সঙ্কোচ করিত না। অনধিক বিলম্বে নবকুমার সমভিব্যাহারিণীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

নবকুমার দেখিলেন যে, ঐ চটিতেই কপালকুণ্ডলা অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার দাসদাসী তজ্জন্য একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়াছিল। নবকুমার স্বীয় সঙ্গিনীর জন্য তৎপার্শ্ববর্ত্তী একখানা ঘর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে তন্মধ্যে

প্রবেশ করাইলেন। তাঁহার আজ্ঞামত গৃহস্বামীর বনিতা প্রদীপ জ্বালিয়া আনিল। যখন দীপরশ্মিস্রোতঃ তাঁহার সঙ্গিনীর শরীরে পড়িল, তখন নবকুমার দেখিলেন যে, ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপরাশিতরঙ্গে তাঁহার যৌবন-শোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পান্থনিবাসে

"কৈষা যোষিৎ প্রকৃতিচপলা।"

—উদ্ধবদূত।

যদি এই রমণী নির্দ্দোষসৌন্দর্য্যবিশিষ্টা হইতেন, তবে বলিতাম, পুরুষ পাঠক! ইনি আপনার গৃহিণীর ন্যায় সুন্দরা। আর সুন্দরী পাঠকারিণি! ইনি আপনার দর্পণস্থ ছায়ার ন্যায় রূপবতী। তাহা হইলে রূপবর্ণনার একশেষ হইত! দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নহেন; সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল।

ইনি যে নির্দ্দোষসুন্দরী নহেন, তাহা বলিবার কারণ এই যে, প্রথমতঃ ইহার শরীর মধ্যমাকৃতির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ; দ্বিতীয়তঃ অধরৌষ্ঠ কিছু চাপা; তৃতীয়তঃ প্রকৃতপক্ষে ইনি গৌরাঙ্গী নহেন।

শরীর ঈষদ্দীর্ঘ বটে, কিন্তু হস্তপদ-হৃদয়াদি সর্ব্বাঙ্গ সুগোল, সম্পূর্ণীভূত। বর্ষাকালে বিটপিলতা যেমন আপন পত্ররাশির বাহুল্যে দলমল করে, ইহার শরীর তেমনই আপন পূর্ণতায় দলমল করিতেছিল; সুতরাং ঈষদ্দীর্ঘ দেহও পূর্ণতাহেতু অধিকতর শোভার কারণ হইয়াছিল; যাঁহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে গৌরাঙ্গী বলি, তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও বর্ণ পূর্ণচন্দ্রকৌমুদীর ন্যায়, কাহারও কাহারও ঈষদারক্তবদনা উষার ন্যায়। ইহার বর্ণ এতদুভয়বর্জ্জিত; সুতরাং ইহাকে প্রকৃত গৌরাঙ্গী বলিলাম না বটে, কিন্তু মুগ্ধকরী শক্তিতে ইঁহার বর্ণও ন্যূন নহে। ইনি শ্যামবর্ণা। "শ্যামা মা" বা "শ্যামসুন্দর" যে শ্যামবর্ণের উদাহরণ, এ সে শ্যামবর্ণ নহে, তপ্তকাঞ্চনের যে শ্যামবর্ণ, এ সেই শ্যাম। পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাম্বুদকিরীটিনী উষা যদি গৌরাঙ্গীদিগের বর্ণপ্রতিমা হয়, তবে বসন্ত-প্রসূত নবচূতদলরাজির শোভা এই শ্যামার বর্ণের অনুরূপ বলা যাইতে পারে। পাঠকমহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে গৌরাঙ্গীর বর্ণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, কিন্তু যদি কেহ এরূপ শ্যামার মন্ত্রে মুগ্ধ হয়েন, তবে তাঁহাকে বর্ণজ্ঞানশূন্য বলিতে পারিব না। এ কথায় যাঁহার বিরক্তি জন্মে, তিনি একবার নবচূতপল্লববিরাজী ভ্রমরশ্রেণীর ন্যায় সেই উজ্জ্বল-শ্যামললাটবিলম্বী অলকাবলী মনে করুন। সেই সপ্তমীচন্দ্রাকৃতললাট-তলস্থ অলকস্পর্শী ভ্রূযুগ মনে করুন; সেই পক্কচূতোজ্জ্বল কপোলদেশ মনে করুন; তন্মধ্যবর্ত্তী ঘোরারক্ত ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর মনে করুন; তাহা হইলে এই অপরিচিতা রমণীকে সুন্দরীপ্রধানা বলিয়া অনুভূত হইবে। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে কিন্তু সুবঙ্কিম

পল্লবরেখাবিশিষ্ট—আর অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি পড়িলে তুমি তৎক্ষণাৎ অনুভূত কর যে, এ স্ত্রীলোক তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়; চক্ষু সুকোমল স্নেহ রসে গলিয়া যায়। আবার কখন বা তাহাতে কেবল সুখাবেশজনিত ক্লান্তিপ্রকাশমাত্র, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্নশয্যা। কখন বা লালসাবিস্ফারিত মদনরসে টলমলায়মান। আবার কখন লোলাপাঙ্গে ক্রুর কটাক্ষ—যেন মেঘমধ্যে বিদ্যুদ্দাম। মুখকান্তিমধ্যে দুইটি অনির্ব্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বত্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় মহান্ আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত, ইনি রমণীকুলরাজ্ঞী।

সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর—ভাদ্রমাসের ভরা নদী। ভাদ্রমাসের নদীজলের ন্যায় ইঁহার রূপরাশি টলটল করিতেছিল—উছলিয়া পড়িতেছিল। বর্ণাপেক্ষা, নয়নাপেক্ষা, সর্ব্বাপেক্ষা, সেই সৌন্দর্য্যের পরিপ্লব মুগ্ধকর। পূর্ণযৌবনভরে সর্ব্বশরীর সতত ঈষচ্চঞ্চল; বিনা বায়ুতে নব শরতের নদী যেমন ঈষচ্চঞ্চল, তেমনি চঞ্চল; সে চাঞ্চল্য মুহুর্মুহুঃ নূতন নূতন শোভা বিকাশের কারণ। নবকুমার নিমেষশূন্যচক্ষে সেই নূতন নূতন শোভা দেখিতেছিলেন।

সুন্দরী নবকুমারের চক্ষু নিমেষশূন্য দেখিয়া কহিলেন, "আপনি কি দেখিতেছেন? আমার রূপ?"

নবকুমার ভদ্রলোক; অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিলেন। নবকুমারকে নিরুত্তর দেখিয়া অপরিচিতা পুনরপি হাসিয়া কহিলেন, "আপনি কখন কি স্ত্রীলোক দেখেন নাই, না আপনি আমাকে বড় সুন্দরী মনে করিতেছেন?"

সহজে এ কথা কহিলে তিরস্কারস্বরূপ বোধ হইত, কিন্তু রমণী যে হাসির সহিত বলিলেন, তাহাতে ব্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইল না। নবকুমার দেখিলেন, এ অতি মুখরা; মুখরার কথায় কেন না উত্তর করিবেন? কহিলেন, "আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।"

রমণী সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটিও না?"

নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার রূপ জাগিতেছিল; তিনিও সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "একটিও না, এমন বলিতে পারি না।"

প্রস্তরে লৌহের আঘাত পড়িল। উত্তরকারিণী কহিলেন, "তবুও ভাল। সেটি কি আপনার গৃহিণী?"

নব। কেন? গৃহিণী কেন মনে ভাবিতেছ?

স্ত্রী। বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

নব। আমি বাঙ্গালী; আপনিও ত বাঙ্গালীর ন্যায় কথা কহিতেছেন। আপনি তবে কোন দেশীয়?

যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিম-প্রদেশীয়া মুসলমানী।" নবকুমার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিম-প্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই

বলিতেছে। ক্ষণপরে তরুণী বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়! বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন—আপনি পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায় ?"

নবকুমার কহিলেন, "আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।"

বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জল করিতে লাগিলেন।

ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না ?"

নবকুমার বলিলেন, "নবকুমার শর্ম্মা।"

প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্দরী-সন্দর্শনে

"———ধর দেবি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণ।"

—মেঘনাদবধ।

নবকুমার গৃহস্বামিনীকে ডাকিয়া অন্য প্রদীপ আনিতে বলিলেন। অন্য প্রদীপ আনিবার পূর্ব্বে একটি দীর্ঘনিশ্বাসশব্দ শুনিতে পাইলেন। প্রদীপ আনিবার ক্ষণেক পরে ভৃত্যবেশী এক জন মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "সে কি, তোমাদিগের এত বিলম্ব হইল কেন ? আর সকলে কোথায় ?"

ভৃত্য কহিল, "বাহকেরা সকলে মাতোয়ারা হইয়াছিল! তাহাদের গুছাইয়া আনিতে আমরা পাল্কীর পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম। পরে ভগ্নশিবিকা দেখিয়া এবং আপনাকে না দেখিয়া আমরা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। কেহ কেহ সেই স্থানে আছে ; কেহ কেহ অন্যান্য দিকে আপনার সন্ধানে গিয়াছে। আমি এদিকে সন্ধানে আসিয়াছি।"

মতি কহিলেন "তাহাদিগকে লইয়া আইস।"

নফর সেলাম করিয়া চলিয়া গেল, বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্নকপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন।

নবকুমার বিদায় চাহিলেন। তখন মতি স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন ?"

নব। ইহারই পরের ঘরে।

মতি। আপনার সে ঘরের কাছে একখানি পাল্কী দেখিলাম, আপনার কি কেহ সঙ্গী আছেন?

"আমার স্ত্রী সঙ্গে।"

মতিবিবি আবার ব্যঙ্গের অবকাশ পাইলেন। কহিলেন, "তিনিই কি অদ্বিতীয়া রূপসী?

নব। দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

মতি। দেখা কি পাওয়া যায়?

নব। (চিন্তা করিয়া) ক্ষতি কি?

মতি। তবে একটু অনুগ্রহ করুন। অদ্বিতীয়া রূপসীকে দেখিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। আগরা গিয়া বলিতে চাহি; কিন্তু এখনই নহে—আপনি এখন যান। ক্ষণেক পরে আমি আপনাকে সংবাদ করিব।

নবকুমার চলিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে অনেক লোকজন, দাসদাসী ও বাহক সিন্দুকাদি লইয়া উপস্থিত হইল। একখানি শিবিকাও আসিল; তাহাতে একজন দাসী। পরে নবকুমারের নিকট সংবাদ আসিল, "বিবি স্মরণ করিয়াছেন।"

নবকুমার মতিবিবির নিকট পুনরাগমন করিলেন। দেখিলেন, এবার আবার রূপান্তর। মতিবিবি পূর্ব্বপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণমুক্তাদিশোভিত কারুকার্য্যযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন। নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারে খচিত করিয়াছেন; যেখানে যাহা ধরে—কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে সর্ব্বত্র সুবর্ণমধ্য হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে। নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। অধিকাংশ স্ত্রীলোক বহু স্বর্ণখচিত হইলে প্রায় কিছু শ্রীহীনা হয়,—অনেকেই সজ্জিতা পুত্তলিকার দশা প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু মতিবিবিতে সে শ্রীহীনতা বা দশা দৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। (প্রভূতনক্ষত্রমালাভূষিত আকাশের ন্যায়—মধুরায়ত শরীরসহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, বরং তাহাতে আরও সৌন্দর্য্য-প্রভা বর্দ্ধিত হইল।) মতিবিবি নবকুমারকে কহিলেন, "মহাশয়, চলুন; আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।" নবকুমার বলিলেন, "সে জন্য অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।"

মতিবিবি। গহনাগুলি না হয় দেখাইবার জন্য পরিয়াছি; স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে সে না দেখাইলে বাঁচে না। এখন চলুন।

নবকুমার মতিবিবিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন। যে দাসী শিবিকারোহণে আসিয়াছিল, সেও সঙ্গে চলিল। ইহার নাম পেষ্‌মন।

কপালকুণ্ডলা দোকানঘরের আর্দ্র মৃত্তিকায় একাকিনী বসিয়াছিলেন। একটি ক্ষীণালোক প্রদীপ জলিতেছে মাত্র—আবদ্ধ নিবিড় কেশরাশি পশ্চাদ্ভাগ অন্ধকার করিয়া রহিয়াছিল। মতিবিবি প্রথম যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন অধরপার্শ্বে ও নয়নপ্রান্তে ঈষৎ হাসি ব্যক্ত হইল। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য প্রদীপটি তুলিয়া কপালকুণ্ডলার মুখের নিকট আনিলেন। তখন সে হাসি হাসি ভাব দূর হইল;

মতির মুখ গম্ভীর হইল ;—অনিমেষলোচনে দেখিতে লাগিলেন। কেহ কোন কথা কহেন না।—মতি মুগ্ধা ; কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

ক্ষণেক পরে মতি আপন অঙ্গ হইতে অলঙ্কাররাশি মোচন করিতে লাগিলেন। মতি আত্মশরীর হইতে অলঙ্কাররাশি মুক্ত করিয়া একে একে কপালকুণ্ডলাকে পরাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা কিছু বলিলেন না। নবকুমার কহিতে লাগিলেন, "ও কি হইতেছে?" মতি তাহার কোন উত্তর করিলেন না।

অলঙ্কার-সমাবেশ সমাপ্ত হইলে, মতি নবকুমারকে কহিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন ; এ ফুল রাজোদ্যানেও ফুটে না। পরিতাপ এই যে, রাজধানীতে এ রূপরাশি দেখাইতে পারিলাম না। এ সকল অলঙ্কার এই অঙ্গেরই উপযুক্ত—এই জন্য পরাইলাম। আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন।"

নবকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সে কি! এ যে বহুমূল্য অলঙ্কার, আমি এ সব লইব কেন?"

মতি কহিলেন, "ঈশ্বরপ্রসাদাৎ আমার আরও আছে। আমি নিরাভরণ হইব না। ইহাকে পরাইয়া আমার যদি সুখবোধ হয়, আপনি কেন ব্যাঘাত করেন।"

মতিবিবি ইহা কহিয়া দাসীর সঙ্গে চলিয়া গেলেন। বিরলে আসিলে পেষমন মতিবিবিকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবি এ ব্যক্তি কে?"

যবনবালা উত্তর করিলেন, "মেরা খসম্।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিবিকারোহণে

"——খুলিনু সত্বরে,
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা,
কুণ্ডল, নূপুর, কাঞ্চী।"

মেঘনাদবধ।

গহনার দশা কি হইল, বলি শুন। মতিবিবি গহনা রাখিবার জন্য একটি রৌপ্যজড়িত হস্তিদন্তের কৌটা পাঠাইয়া দিলেন। দস্যুরা তাঁহার অল্প সামগ্রীই লইয়াছিল—নিকটে যাহা ছিল, তদ্ব্যতীত কিছুই পায় নাই।

নবকুমার দুই একখানি গহনা কপালকুণ্ডলার অঙ্গে রাখিয়া অধিকাংশ কৌটায় তুলিয়া রাখিলেন। পরদিন প্রভাতে মতিবিবি বর্দ্ধমানাভিমুখে, নবকুমার সপত্নীক সপ্তগ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে শিবিকাতে তুলিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গে গহনার কৌটা দিলেন। বাহকেরা সহজেই নবকুমারকে পশ্চাৎ করিয়া চলিল। কপালকুণ্ডলা শিবিকার দ্বার খুলিয়া চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলেন ;

এক জন ভিক্ষুক তাহাকে দেখিতে পাইয়া, ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "আমার ত কিছুই নাই, তোমাকে কি দিব ?"

ভিক্ষুক কপালকুণ্ডলার অঙ্গে যে দুই একখানা অলঙ্কার ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "সে কি মা! তোমার গায়ে হীরা-মুক্তা—তোমার কিছুই নাই ?"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গহনা পাইলে তুমি সন্তুষ্ট হও ?"

ভিক্ষুক কিছু বিস্মিত হইল। ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত। ক্ষণমাত্র পরে বলিল, "হই বৈ কি।"

কপালকুণ্ডলা অকপটহৃদয়ে কৌটা সমেত সকল গহনাগুলি ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন। অঙ্গের অলঙ্কারগুলিও খুলিয়া দিলেন।

ভিক্ষুক ক্ষণেক বিহ্বল হইয়া রহিল। দাসদাসী কিছুমাত্র জানিতে পারিল না। ভিক্ষুকের বিহ্বলভাব ক্ষণিকমাত্র। তখনই এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গহনা লইয়া পলায়ন করিল। কপালকুণ্ডলা ভাবিলেন, "ভিক্ষুক দৌড়িল কেন ?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

স্বদেশে

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলং কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।

—মেঘদূত।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া স্বদেশে উপনীত হইলেন। নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা, তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা, কেন না তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।

অবস্থান্তরে নবকুমার অজ্ঞাতকুলশীল তপস্বিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনায়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন কতদূর সন্তুষ্টিপ্রকাশ করিতেন, তাহা আমরা বলিয়া উঠিতে পারিলাম না। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে তাঁহাকে কোন ক্লেশ পাইতে হয় নাই। সকলেই তাঁহার প্রত্যাগমনপক্ষে নিরাশ্বাস হইয়াছিল। সহযাত্রীরা প্রত্যাগমন করিয়া রটনা করিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন যে, এই সত্যবাদীরা আত্মপ্রতীতিমতই কহিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তির অবমাননা করা হয়। প্রত্যাগত যাত্রীর মধ্যে অনেকে নিশ্চিত করিয়া কহিয়াছিলেন যে, নবকুমারকে ব্যাঘ্রমুখে পড়িতে তাঁহারা প্রত্যক্ষই দৃষ্টি করিয়াছিলেন। কখন কখন ব্যাঘ্রটার পরিমাণ লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইল; কেহ বলিলেন, "ব্যাঘ্রটা আট হাত হইবে।" কেহ কহিলেন; "না। প্রায় চৌদ্দ হাত।"

পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন যাত্রী কহিলেন, "যাহা হউক, আমি বড় রক্ষা পাইয়াছিলাম। ব্যাঘ্রটা আমাকেই অগ্রে তাড়া করিয়াছিল, আমি পলাইলাম ; নবকুমার তত সাহসী পুরুষ নহে ; পলাইতে পারিল না।"

যখন এই সকল রটনা নবকুমারের মাতা প্রভৃতির কর্ণগোচর হইল, তখন পুর-মধ্যে এমন ক্রন্দনধ্বনি উঠিল যে, কয় দিন তাহার ক্ষান্তি হইল না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নবকুমারের মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। এমন সময়ে যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল। নবকুমারের মাতা মহা সমাদরে বধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন।

যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলা লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই ;—অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ-প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই ; এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্য্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই। পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল। জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধকারী উপল-মোচনে যেরূপ দুর্গম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।

এই প্রেমাবির্ভাব সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না, কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই যেরূপ সজললোচনে তাহার প্রতি অনিমিখ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত ; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত ; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত ; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত ; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত ; সর্ব্বদা অন্যমনস্কতাসূচক পদবিক্ষেপও প্রকাশ পাইত। তাঁহার প্রকৃতি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাঞ্চল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য্য জন্মিল ; যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল। নবকুমারের মুখ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল ; বিরক্তিজনকের প্রতি বিরাগের লাঘব হইল ; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল ; পৃথিবী সৎকর্ম্মের জন্য মাত্র সৃষ্টা বোধ হইতে লাগিল। সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ। প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব? চল পাঠক, তাহাকে দর্শন করি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অবরোধে

"কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভিবল্কলম্।
বদ প্রদোষে স্ফুটচন্দ্রতারকা
বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে॥"

—কুমারসম্ভব।

সকলেই অবগত আছেন যে, পূর্ব্বকালে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। এককালে যবদ্বীপ হইতে রোমক পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশের বণিকেরা বাণিজ্যার্থ এই মহানগরীতে মিলিত হইত; কিন্তু বঙ্গীয় দশম একাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির লাঘব জন্মিয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তন্নগরীর প্রান্তভাগ প্রক্ষালিত করিয়া যে স্রোতস্বতী বাহিত হইত, এক্ষণে তাহা সঙ্কীর্ণ-শরীরা হইয়া আসিয়াছিল, সুতরাং বৃহদকার জলযান সকল আর নগরী পর্য্যন্ত আসিতে পারিত না। এ কারণ বাণিজ্যবাহুল্য ক্রমে লুপ্ত হইতে লাগিল। বাণিজ্যগৌরবা নগরীর বাণিজ্যনাশ হইলে সকলই যায়। সপ্তগ্রামের সকলই গেল। বঙ্গীয় একাদশ শতাব্দীতে হুগলী নূতন সৌষ্ঠবে তাহার প্রতিযোগী হইয়া উঠিয়াছিল। তথায় পর্ত্তুগীসেরা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া সপ্তগ্রামের ধনলক্ষ্মীকে আকর্ষিতা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও সপ্তগ্রাম একেবারে হতশ্রী হয় নাই। তথায় এ পর্য্যন্ত ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান রাজপুরুষদিগের বাস ছিল; কিন্তু নগরীর অনেকাংশ শ্রীভ্রষ্টা এবং বসতিহীনা হইয়া পল্লীগ্রামের আকার ধারণ করিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন ঔপনগরিক ভাগে নবকুমারের বাস। এক্ষণে সপ্তগ্রামের ভগ্নদশায় তথায় প্রায় মনুষ্যসমাগম ছিল না; রাজপথসকল লতাগুল্মাদিতে পরিপূরিত হইয়াছিল। নবকুমারের বাটীর পশ্চাত্তেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূর একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টকরচিত; দেশকাল বিবেচনা করিলে তাহাকে নিতান্ত সামান্য গৃহ বলা যাইতে পারিত না। দোতলা বটে, কিন্তু ভয়ানক উচ্চ নহে, এখন একতলায় সেরূপ উচ্চতা অনেক দেখা যায়।

এই গৃহের সৌধোপরি দুইটি নবীনবয়সী স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জক বটে। নিকটে এক দিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরীর অসংখ্য সৌধমালা নববসন্তপবনস্পর্শ-লোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা পাইতেছে। অন্য দিকে অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্ষণে ক্ষণে গাঢ়তর হইতেছে।

যে নবীনাদ্বয় প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক জন চন্দ্ররশ্মিবর্ণাভা, অবিন্যস্ত কেশভারমধ্যে প্রায় অর্দ্ধলুক্কায়িতা ; অপরা কৃষ্ণাঙ্গী। তিনি সুমুখী ষোড়শী! তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাঁহার উপরার্দ্ধে চারিদিক্ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে ; যেন নীলোৎপলদলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়ন-যুগল বিস্ফারিত, কোমল, শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ ; অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন যে চন্দ্র-রশ্মিবর্ণ-শোভিনী কপালকুণ্ডলা ; তাঁহাকে বলিয়া দিই, কৃষ্ণাঙ্গী তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী।

শ্যামাসুন্দরী ভ্রাতৃজায়াকে কখন "বউ," কখন আদর করিয়া "বন," কখন "মৃনো"— সম্বোধন করিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলা নামটি বিকট বলিয়া গৃহস্থেরা তাঁহার নাম মৃণ্ময়ী রাখিয়াছিলেন ; এই জন্যই "মৃনো" সম্বোধন! আমরাও এখন কখন কখন ইহাকে মৃণ্ময়ী বলিব।

শ্যামাসুন্দরী একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

"বলে—পদ্মরাণী, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নাম্‌লে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছি ছি—সরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি এ কি জ্বালা বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥

তুই কি লো একা তপস্বিনী থাকিবি ?"

মৃণ্ময়ী উত্তর করিল, "কেন, কি তপস্যা করিতেছি ?"

শ্যামাসুন্দরী দুই করে মৃণ্ময়ীর কেশতরঙ্গমালা তুলিয়া কহিল, "তোমার এ চুলের রাশি কি বাঁধিবে না ?"

মৃণ্ময়ী কেবল ঈষৎ হাসিয়া শ্যামাসুন্দরীর হাত হইতে কেশগুলি টানিয়া লইলেন।

শ্যামাসুন্দরী আবার কহিলেন, "ভাল, আমার সাধটি পূরাও। একবার আমাদের গৃহস্থের মেয়ের মত সাজ। কত দিন যোগিনী থাকিবে ?"

মৃ। যখন এই ব্রাহ্মণসন্তানের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তখন ত আমি যোগিনীই ছিলাম।

শ্যা। এখন আর থাকিতে পারিবে না।

মৃ। কেন থাকিব না ?

শ্যা। কেন ? দেখিবি ? তোর যোগ ভাঙ্গিব ? পরশ-পাতর কাহাকে বলে জান ?

মৃণ্ময়ী কহিলেন "না।"

শ্যা। পরশ-পাতরের স্পর্শে রাঙ্গও সোনা হয়।

মৃ। তাতে কি।

শ্যা। মেয়েমানুষেরও পরশপাতর আছে।

মৃ। সে কি ?

শ্যা। পুরুষ। পুরুষের বাতাসে যোগিনীও গৃহিণী হইয়া যায়। তুই সেই পাতর ছুঁয়েছিস্। দেখিবি,—

বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভ'রে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥

মৃন্ময়ী কহিলেন, "ভাল, বুঝিলাম। পরশ-পাতর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলেম। চুল বাঁধিলাম, ভাল কাপড় পরিলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরিলাম, কানে দুল দুলিল, চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, পান, গুয়া, সোনার পুত্তলি পর্য্যন্ত হইল। মনে কর, সকলই হইল। তাহা হইলেই বা কি সুখ ?"

শ্যা। বল দেখি, ফুলটি ফুটিলে কি সুখ ?

মৃ। লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি ?

শ্যামাসুন্দরীর মুখকান্তি গম্ভীর হইল ; প্রভাতবাতাহত নীলোৎপলবৎ বিস্ফারিত চক্ষু ঈষৎ দুলিল ; বলিলেন, "ফুলের কি ? তাহা ত বলিতে পারি না। কখন ফুল হইয়া ফুটি নাই। কিন্তু যদি তোমার মত কলি হইতাম, তবে ফুটিয়া সুখ হইত।"

শ্যামা কুলীনপত্নী।

আমরাও এই অবকাশে পাঠকমহাশয়কে বলিয়া রাখি যে, ফুলের ফুটিয়াই সুখ। পুষ্পরস, পুষ্পগন্ধ বিতরণই তার সুখ। আদান প্রদানই পৃথিবীর সুখের মূল ; তৃতীয় মূল নাই। মৃন্ময়ী বনমধ্যে থাকিয়া এ কথা কখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, অতএব কথার উত্তর দিলেন না।

শ্যামাসুন্দরী তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "আচ্ছা,—তাই যদি না হইল,—তবে শুনি দেখি, তোমার সুখ কি ?"

মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "বলিতে পারি না। বোধ করি সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।"

শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহাদিগের যত্নে যে মৃন্ময়ী উপকৃতা হয়েন নাই, ইহাতে কিঞ্চিত ক্ষুব্ধা হইলেন ; কিছু রুষ্টা হইলেন। কহিলেন, "এখন ফিরিয়া যাইবার উপায় ?"

মৃ। উপায় নাই।

শ্যা। তবে করিবে কি ?

মৃ। অধিকারী কহিতেন, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

শ্যামাসুন্দরী মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "যে আজ্ঞা, ভট্টাচার্য্য মহাশয়! কি হইল?"

মৃন্ময়ী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে।"

শ্যামা। কেন কপালে আর কি আছে? কপালে সুখ আছে। তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেল কেন?

মৃন্ময়ী কহিলেন, "শুন। যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মা'র পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম্ম করিতাম না। যদি কর্ম্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। অপরিচিত ব্যক্তির সহিত অজ্ঞাত দেশে আসিতে শঙ্কা হইতে লাগিল ভাল মন্দ জানিতে মা'র কাছে গেলাম। ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না; অতএব কপালে কি আছে, জানি না।"

মৃন্ময়ী নীরব হইলেন। শ্যামাসুন্দরী শিহরিয়া উঠিলেন।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভূতপূর্ব্বে

"কষ্টোঽয়ং খলু ভৃত্যভাবঃ।"

—রত্নাবলী।

যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া চটি হইতে যাত্রা করেন, তখন মতিবিবি পথান্তরে বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ মতিবিবি পথবাহন করেন, ততক্ষণ আমরা তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত কিছু বলি। মতির চরিত্র মহাদোষ-কলুষিত, মহদ্গুণেও শোভিত। এরূপ চরিত্রের বিস্তারিত বৃত্তান্তে পাঠক মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

যখন ইহার পিতা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন, তখন ইহার হিন্দুনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া লুৎফ-উন্নিসা নাম হইল। মতিবিবি কোন কালেও ইহার নাম নহে। তবে কখন কখন ছদ্মবেশে দেশবিদেশভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন। ইহার পিতা ঢাকায় আসিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তথায় অনেক নিজদেশীয় লোকের সমাগম। দেশীয় সমাজে সমাজচ্যুত হইয়া সকলের থাকিতে ভাল লাগে না। অতএব তিনি কিছুদিনে সুবাদারের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিয়া তাঁহার সুহৃদ্ অনেকানেক ওমরাহের নিকট পত্রসংগ্রহ পূর্ব্বক সপরিবারে আগ্রায় আসিলেন। আকবর শাহের নিকট কাহারও গুণ অবিদিত থাকিত না। শীঘ্রই তিনি ইহার গুণ গ্রহণ করিলেন। লুৎফ-উন্নিসার পিতা শীঘ্রই উচ্চ-পদস্থ হইয়া আগ্রার প্রধান ওমরাহমধ্যে গণ্য হইলেন। এ দিকে লুৎফ-উন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য-গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্য রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, নীতি সম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফ-উন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দম-বেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনের কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত, তাহাই করিতেন; যখন সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন; যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফ-উন্নিসা সম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্ব্বস্বামী বর্ত্তমান, ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিণী হইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব? প্রথমে কানাকানি, শেষে কালিমাময় কলঙ্ক রটিল। তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাহাদিগকে কৃপা বিতরণ করিতেন, তন্মধ্যে যুবরাজ সেলিম একজন। একজন ওমরাহের কুলকলঙ্ক জন্মাইলে, পাছে আপনার অপক্ষপাতী পিতার কোপানলে পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় সেলিম এ পর্য্যন্ত লুৎফ-উন্নিসাকে আপন অবরোধবাসিনী করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সুযোগ পাইলেন। রাজপুতপতি মানসিংহের ভগিনী যুবরাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। যুবরাজ লুৎফ-উন্নিসাকে তাঁহার প্রধানা সহচরী করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহ-ভাগিনী হইলেন।

লুৎফ-উন্নিসার ন্যায় বুদ্ধিমতী মহিলা যে অল্পদিনেই রাজকুমারের হৃদয়াধিকার করিবেন, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সেলিমের চিত্তে তাঁহার প্রভুত্ব এরূপ প্রতিযোগিশূন্য হইয়া উঠিল যে, লুৎফ-উন্নিসা উপযুক্ত সময়ে তাঁহার পাটরাণী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির-প্রতিজ্ঞা হইল। কেবল লুৎফ-উন্নিসার স্থির-প্রতিজ্ঞা হইল, এমন নহে, রাজপুরবাসী সকলেরই ইহা সম্ভব বোধ হইল। এইরূপ আশার স্বপ্নে লুৎফ-উন্নিসা জীবন বাহিত করিতেছিলেন, এমন সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল। আকবর শাহের কোষাধ্যক্ষ (আকৃতিবাদ উদ্দৌলা) খাজা আয়াসের কন্যা মেহের-উন্নিসা যবন-কুলে প্রধানা সুন্দরী। এক দিন কোষাধ্যক্ষ রাজকুমার সেলিম ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিলেন। সেই দিন মেহের-উন্নিসার সহিত সেলিমের সাক্ষাৎ হইল এবং সেই দিন সেলিম মেহের-উন্নিসার নিকট চিত্ত রাখিয়া গেলেন। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। শের আফগান নামক এক জন মহা-বিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্ব্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তি সকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল,—তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহার নিস্তার নাই। আক্‌বর শাহের মৃত্যু হইলেই তাঁহারও প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন। লুৎফ-উন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করিলেন।

মহম্মদীয় সম্রাট্-কুল-গৌরব আকবরের পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। যে প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভায় তুরকী হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সে সূর্য্য অস্তগামী হইল। এ সময়ে লুৎফ-উন্নিসা আত্মপ্রাধান্য রক্ষার জন্য এক দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিলেন।

রাজপুতপতি রাজা মানসিংহের ভগিনী সেলিমের প্রধানা মহিষী। খস্রু তাঁহার পুত্র। একদিন তাঁহার সহিত আক্‌বর শাহের পীড়িত-শরীর সম্বন্ধে লুৎফ-উন্নিসার কথোপকথন হইতেছিল, রাজপুত-কন্যা এক্ষণে বাদশাহ-পত্নী হইবেন, এই কথার প্রসঙ্গ করিয়া লুৎফ-উন্নিসা তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছিলেন। প্রত্যুত্তরে খস্রুর জননী কহিলেন, "বাদশাহের মহিষী হইলে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয় বটে, কিন্তু যে বাদশাহজননী, সেই সর্ব্বোপরি।" উত্তর শুনিবামাত্র এক অপূর্ব্ব-চিন্তিত অভিসন্ধি লুৎফ-উন্নিসার

হৃদয়ে উদয় হইল। তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাহাই হউক না কেন? সেও ত আপনার ইচ্ছাধীন।" বেগম কহিলেন, "সে কি?" চতুরা উত্তর করিলেন, "যুবরাজ খস্রুকে সিংহাসন দান করুন।"

বেগম কোন উত্তর করিলেন না। সেদিন এ প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হইল না; কিন্তু কেহই এ কথা ভুলিলেন না। স্বামীর পরিবর্ত্তে পুত্র যে সিংহাসনারোহণ করেন, ইহা বেগমের অনভিমত নহে, মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ উন্নিসার যেরূপ হৃদয়শেল, বেগমেরও সেইরূপ। মানসিংহের ভগিনী আধুনিক তুর্কমান-কন্যার যে আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবেন, তাহা ভাল লাগিবে কেন? লুৎফ-উন্নিসারও এ সঙ্কল্পে উদ্যোগিনী হইবার গাঢ় তাৎপর্য্য ছিল। অন্যদিন পুনর্ব্বার এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। উভয়ের মত স্থির হইল।

সেলিমকে ত্যাগ করিয়া খস্রুকে আকবরের সিংহাসনে স্থাপিত করা অসম্ভাবনীয় বোধ হইবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা লুৎফ-উন্নিসা বেগমের বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করাইলেন। তিনি কহিলেন, "মোগলের সাম্রাজ্য রাজপুতের বাহুবলে স্থাপিত রহিয়াছে; সেই রাজপুত-জাতির চূড়া রাজা মানসিংহ, তিনি খস্রুর মাতুল; আর মুসলমানদিগের প্রধান খাঁ আজিম, তিনি প্রধান রাজমন্ত্রী, তিনি খস্রুর শ্বশুর; ইঁহারা দুই জনে উদ্যোগী হইলে কে ইঁহাদিগের অনুবর্ত্তী না হইবে? আর কাহার বলেই বা যুবরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিবেন? রাজা মানসিংহকে এ কার্য্যে ব্রতী করা আপনার ভার। খাঁ আজিম ও অন্যান্য মহম্মদীয় ওমরাহগণকে লিপ্ত করা আমার ভার। আপনার আশীর্ব্বাদে কৃতকার্য্য হইব, কিন্তু এক আশঙ্কা, পাছে সিংহাসন আরোহণ করিয়া খস্রু এ দুশ্চারিণীকে পুরবহিষ্কৃত করিয়া দেন।"

বেগম সহচরীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "তুমি আগ্রায় যে ওমরাহের গৃহিণী হইতে চাও, সেই তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তোমার স্বামী পঞ্চ হাজারী মন্সবদার হইবেন"

লুৎফ-উন্নিসা সন্তুষ্ট হইলেন। ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে হইল, তবে প্রতিপুষ্পবিহারিণী মধুকরীর পক্ষচ্ছেদন করিয়া কি সুখ হইল? যদি স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে হইল, তবে বাল্যসখি মেহের-উন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ? তাহার অপেক্ষা কোন রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হওয়া গৌরবের বিষয়।

শুধু এই লোভে লুৎফ-উন্নিসা এ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন না। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, ইহার প্রতিশোধও তাঁহার উদ্দেশ্য।

খাঁ আজিম প্রভৃতি আগ্রা-দিল্লীর ওমরাহেরা লুৎফ-উন্নিসার বিলক্ষণ বাধ্য ছিলেন। খাঁ আজিম যে জামাতার ইষ্টসাধনে উদ্যুক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। তিনি এবং আর আর ওমরাহগণ সম্মত হইলেন, খাঁ আজিম লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "মনে কর, যদি কোন অনুযোগে আমরা কৃতকার্য্য না হই, তবে তোমার আমার রক্ষা নাই। অতএব প্রাণ বাঁচাইবার একটা পথ রাখা ভাল।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপনার কি পরামর্শ?" খাঁ আজিম কহিলেন, "উড়িষ্যা

ভিন্ন অন্য আশ্রয় নাই। কেবল সেই স্থানে মোগলের শাসন তত প্রখর নহে, উড়িষ্যার সৈন্য আমাদিগের হস্তগত থাকা আবশ্যক। তোমার ভ্রাতা উড়িষ্যার মন্সবদার আছেন। আমি কল্য প্রচার করিব, তিনি যুদ্ধে আহত হইয়াছেন। তুমি তাঁহাকে দেখিবার ছলে কল্যই উড়িষ্যায় যাত্রা কর। তথায় যৎকর্ত্তব্য, তাহা সাধন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর।"

লুৎফ-উন্নিসা এ পরামর্শে সম্মত হইলেন, তিনি উড়িষ্যায় আসিয়া যখন প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সহিত পাঠক মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথান্তরে

"যে মাটীতে পড়ে লোকে উঠে তাই ধ'রে।
বারেক নিরাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে॥
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল।
আজিকে বিফল হলো, হ'তে পারে কাল॥"

নবীন তপস্বিনী।

যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতিবিবি বা লুৎফ-উন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সে দিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষমনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল, এমতকালে মতি সহসা পেষমন্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেষমন্! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?"

পেষ্‌মন্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেমন আর দেখিব?" মতি কহিলেন, "সুন্দর পুরুষ বটে কি না?"

নবকুমারের প্রতি পেষ্‌মনের বিশেষ বিরাগ জন্মিয়াছিল। যে অলঙ্কারগুলি মতি কপালকুণ্ডলাকে দিয়াছিলেন, তৎপ্রতি পেষ্‌মনের বিশেষ লোভ ছিল; মনে মনে ভরসা ছিল, একদিন চাহিয়া লইবে। সেই আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল; সুতরাং কপালকুণ্ডলা এবং তাঁহার স্বামী উভয়ের প্রতি তাহার দারুণ বিরক্তি! অতএব স্বামিনীর প্রশ্নে উত্তর করিল, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ আবার সুন্দর কুৎসিত কি?"

সহচরীর মনের ভাব বুঝিয়া মতি হাস্য করিয়া কহিলেন, "দরিদ্র ব্রাহ্মণ যদি ওমরাহ হয়, তবে সুন্দর পুরুষ হইবে কি না?"

পে। সে আবার কি?

মতি। কেন, তুমি জান না যে, বেগম স্বীকার করিয়াছেন যে, খস্রু বাদশাহ হইলে আমার স্বামী ওমরাহ হইবে?

পে। তা ত জানি, কিন্তু তোমার পূর্ব্বস্বামী ওমরাহ হইবেন কেন?

মতি। তবে আমার কোন্ স্বামী আছে?

পে। যিনি নূতন হইবেন।

মতি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার ন্যায় সতীর দুই স্বামী বড় অন্যায় কথা—ও কে? যাইতেছে।"

যাহাকে দেখিয়া মতি কহিলেন, "ও কে যাইতেছে?" পেষ্‌মন্ তাহাকে চিনিল, সে আগ্রানিবাসী খাঁ আজিমের আশ্রিত ব্যক্তি। উভয়ে ব্যস্ত হইলেন। পেষ্‌মন্ তাহাকে ডাকিল। সে ব্যক্তি আসিয়া লুৎফ-উন্নিসাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একখানি পত্র দান করিল; কহিল, "পত্র লইয়া উড়িষ্যায় যাইতেছিলাম। পত্র জরুরী।"

পত্র পড়িয়া মতিবিবির আশা-ভরসা সকল অন্তর্হিত হইল। পত্রের মর্ম্ম এই—

"আমাদিগের যত্ন বিফল হইয়াছে। মৃত্যুকালেও আকবর শাহ আপন বুদ্ধিবলে আমাদিগকে পরাভূত করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকে গতি হইয়াছে। তাঁহার আজ্ঞাবলে কুমার সেলিম এক্ষণে জাহাঁগীর শাহ হইয়াছেন। তুমি খস্রুর জন্য ব্যস্ত হইবে না। এই উপলক্ষে কেহ তোমার শত্রুতা সাধিতে না পারে, এমত চেষ্টার জন্য তুমি শীঘ্র আগ্রায় ফিরিয়া আসিবে।"

আকবর শাহ যে প্রকারে এ ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করেন, তাহা ইতিহাসে বর্ণিত আছে; এ স্থলে সে বিবরণের আবশ্যকতা নাই।

পুরস্কারপূর্ব্বক দূতকে বিদায় করিয়া মতি পেষ্‌মনকে পত্র শুনাইলেন। পেষ্‌মন কহিল, "এক্ষণে উপায়?"

মতি। এখন আর উপায় নাই।

পে। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, ক্ষতিই কি? যেমন ছিলে তেমনই থাকিবে, মোগল-বাদশাহের পুরস্ত্রীমাত্রেই অন্য রাজ্যের পাটরাণী অপেক্ষাও বড়।

মতি। (ঈষৎ হাসিয়া) তাহা আর হয় না। আর সে রাজপুরে থাকিতে পারিব না। শীঘ্রই মেহের-উন্নিসার সহিত জাহাঁগীরের বিবাহ হইবে। মেহের-উন্নিসাকে আমি কিশোরবয়োবধি ভাল জানি; একবার সে পুরবাসিনী হইলে সে-ই বাদশাহ হইবে। জাহাঁগীর বাদশাহ নামমাত্র থাকিবে। আমি যে তাহার সিংহাসনারোহণের পথরোধের চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ইহা তাহার অবিদিত থাকিবে না। তখন আমার দশা কি হইবে?

পেষ্‌মন প্রায় রোদনোন্মুখী হইয়া কহিল, "তবে কি হইবে?"

মতি কহিলেন, "এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাঁহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি অনুরাগিণী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহ-শালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত শের আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।"

পে। মেহের-উন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, "লুৎফ-উন্নিসার অসাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী—কালি বর্দ্ধমানে গিয়া তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি করিব।"

পে। যদি মেহের-উন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিণী না হন, তাহা হইলে কি করিবে?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, "ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।"

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষ্‌মন জিজ্ঞাসা করিল, "হাসিতেছ কেন?"

মতি কহিলেন, "কোন নূতন ভাব উদয় হইতেছে।"

পে। কি নূতন ভাব?

মতি তাহা পেষ্‌মনকে বলিলেন না। আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না। পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিযোগিনী-গৃহে

"শ্যামাদন্যো ন হি ন হি ন হি প্রাণনাথো মমাস্তি।"

—উদ্ধবদূত

এ সময়ে শের আফগান বঙ্গদেশের সুবাদারের অধীনে বর্দ্ধমানের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন।

মতিবিবি বর্দ্ধমানে আসিয়া শের আফগানের আলয়ে উপনীত হইলেন। শের আফগান সপরিবারে তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে তথায় অবস্থিতি করাইলেন। যখন শের আফগান এবং তাঁহার স্ত্রী মেহের-উন্নিসা আগ্রায় অবস্থিতি করিতেন, তখন মতি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। মেহের-উন্নিসার সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল, পরে উভয়েই দিল্লীর সাম্রাজ্যলাভের জন্য প্রতিযোগিনী হইয়াছিলেন। এক্ষণে একত্র হওয়ায় মেহের-উন্নিসা মনে ভাবিতেছেন, "ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব কাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছেন? বিধাতাই জানেন, আর সেলিম জানেন, আর কেহ যদি জানে ত সে এই লুৎফ-উন্নিসা। দেখি, লুৎফ-উন্নিসা কি কিছু প্রকাশ করিবে না?" মতিবিবিরও মেহের-উন্নিসার মন জানিবার চেষ্টা।

মেহের-উন্নিসা তৎকালে ভারতবর্ষমধ্যে প্রধানা রূপবতী এবং গুণবতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাদৃশ রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য্যে ইতিহাস-কীর্ত্তিতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তাঁহার প্রাধান্য ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন প্রকার বিদ্যায় তাৎকালিক পুরুষদিগের মধ্যে বড় অনেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। নৃত্যগীতে মেহের-উন্নিসা অদ্বিতীয়া; কবিতা-রচনায় বা চিত্র-লেখনেও তিনি সকলের মনোমুগ্ধ করিতেন। তাঁহার সরস কথা তাঁহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মোহময়ী ছিল। মতিও এ সকল গুণে হীনা ছিলেন না। অদ্য এই দুইটি চমৎকারিণী পরস্পরের মন জানিতে উৎসুক হইলেন।

মেহের-উন্নিসা খাস কামরায় বসিয়া তস্‌বীর লিখিতেছিলেন। মতি মেহের-উন্নিসার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্রলিখন দেখিতেছিলেন এবং তাম্বুল চর্ব্বণ

করিতেছিলেন। মেহের-উন্নিসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চিত্র কেমন হইতেছে?" মতি-বিবি উত্তর করিলেন, "তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, ইহাই দুঃখের বিষয়।"

মেহে। তাই যদি সত্য হয় ত দুঃখের বিষয় কেন?

ম। অন্যের তোমার মত চিত্রনৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত।

মেহে। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।

মেহের-উন্নিসা এই কথা কিছু গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন।

ম। ভগিনি! আজ মনের স্ফূর্ত্তির এত অল্পতা কেন?

মেহে। স্ফূর্ত্তির অল্পতা কই। তবে যে তুমি আমাকে কাল প্রাতে ত্যাগ করিয়া যাইবে, তাহাই বা কি প্রকারে ভুলিব? আর দুই দিন থাকিয়া তুমি কেনই বা চরিতার্থ না করিবে?

ম। সুখে কার অসাধ? সাধ্য হইলে আমি কেন যাইব? কিন্তু আমি পরের অধীন, কি প্রকারে থাকিব?

মেহে। আমার প্রতি ভালবাসা তোমার আর নাই, থাকিলে তুমি কোনমতে রহিয়া যাইতে। আসিয়াছ ত রহিতে পার না কেন?

ম। আমি ত সকল কথাই বলিয়াছি। আমার সহোদর মোগলসৈন্যে মন্সবদার—তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন। আমি তাঁহারই বিপৎসংবাদ পাইয়া বেগমের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম। উড়িষ্যায় অনেক বিলম্ব করিয়াছি, এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। তোমার সহিত অনেক দিন দেখা হয় নাই, এই জন্য দুই দিন রহিয়া গেলাম।

মেহে। বেগমের নিকট কোন্ দিন পৌঁছাইবার কথা স্বীকার করিয়া আসিয়াছ?

মতি বুঝিলেন, মেহের-উন্নিসা ব্যঙ্গ করিতেছেন। মার্জ্জিত অথচ মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গে মেহের-উন্নিসা যেরূপ নিপুণ, মতি সেরূপ নহেন। কিন্তু অপ্রতিভ হইবার লোকও নহেন। তিনি উত্তর করিলেন, "দিন নিশ্চিত করিয়া তিন মাসের পথ যাতায়াত করা কি সম্ভবে? কিন্তু অনেক কাল বিলম্ব করিয়াছি; আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে।"

মেহের-উন্নিসা নিজ ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া কহিলেন, "কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ; যুবরাজের না তাঁহার মহিষীর?"

মতি কিঞ্চিত অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "এ লজ্জাহীনাকে কেন লজ্জা দিতে চাও? উভয়ের অসন্তোষ হইতে পারে।"

মে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তুমি স্বয়ং বেগম নাম ধরিতেছ না কেন? শুনিয়াছিলাম, কুমার সেলিম তোমাকে বিবাহ করিয়া খাসবেগম করিবেন; তাহার কত দূর।

ম। আমি সহজেই পরাধীন। যে কিছু স্বাধীনতা আছে, তাহা কেন নষ্ট করিব? বেগমের সহচারিণী বলিয়া অনায়াসে উড়িষ্যায় আসিতে পারিলাম, সেলিমের বেগম হইলে কি উড়িষ্যায় আসিতে পারিতাম?

মে। যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে, তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন ?

ম। সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখন করিনা। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।

মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন, "ভগিনি ! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে শের আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে শের আফগানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।"

লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না ; বরং আরও সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, "তুমি যে পতিগতপ্রাণা, তা আমি বিলক্ষণ জানি। সে জন্যই ছলক্রমে একথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধান থাকিও।"

মে। এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা ?

মতি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, "বৈধব্যের আশঙ্কা।"

এই কথা বলিয়া মতি মেহের-উন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্নদৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় বা আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না। মেহের-উন্নিসা সদর্পে কহিলেন, "বৈধব্যের আশঙ্কা ! শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে। বিশেষ আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না।"

ম। সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে,—আকবর শাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে ?

মেহের-উন্নিসা আর কিছু শুনিলেন না। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদ কেন ?"

মেহের-উন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায় ?"

মতির মনস্কাম সিদ্ধ হইল ; তিনি কহিলেন, "তুমি আজিও যুবরাজকে একেবারে বিস্মৃত হইতে পার নাই ?"

মেহের-উন্নিসা গদ্গদস্বরে কহিলেন, "কাহাকে বিস্মৃত হইব ? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব, তথাপি যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না। কিন্তু শুন ভগিনি ! অকস্মাৎ মনের কপাট খুলিল। তুমি এ কথা শুনিলে ; কিন্তু আমার শপথ, এ কথা যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

মতি কহিল, "ভাল, তাহাই হইবে। কিন্তু যখন সেলিম শুনিবেন যে আমি বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলাম, তখন তিনি অবশ্য জিজ্ঞাসা করিবেন যে মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল ? তখন আমি কি উত্তর করিব ?"

মেহের-উন্নিসা কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিলেন, "এই কহিও যে মেহের-উন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখন আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখন দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবে না।"

ইহা কহিয়া মেহের-উন্নিসা সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মতিবিবি চমৎকৃত হইয়া রহিলেন, কিন্তু মতিবিবিরই জয় হইল। মেহের-উন্নিসার চিত্তের ভাব মতিবিবি জানিলেন; মতিবিবির আশা-ভরসা মেহের-উন্নিসা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যিনি পরে আত্ম-বুদ্ধি প্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ, মেহের-উন্নিসা প্রণয়শালিনী, মতিবিবি এস্থলে কেবলমাত্র স্বার্থপরায়ণা।

মনুষ্য-হৃদয়ের বিবিত্র গতি মতিবিবি বিলক্ষণ বুঝিতেন। মেহের-উন্নিসার কথা আলোচনা করিয়া তিনি যাহা সিদ্ধান্ত করিলেন, কালে তাহাই যথার্থীভূত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অনুরাগিণী; অতএব নারীদর্পে এখন যাহাই বলুন, পথ মুক্ত হইলে মনের গতি রোধ করিতে পারিবেন না। বাদশাহের মনস্কামনা অবশ্য সিদ্ধ করিবেন।

এ সিদ্ধান্তে মতির আশা-ভরসা সকলই নির্ম্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে। বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন, পথে কয়েক দিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজনিকেতন

"পত্নীভাবে আর তুমি ভেবো না আমারে।"

—বীরাঙ্গনা কাব্য।

মতি আগ্রায় উপনীতা হইলেন। আর তাঁহাকে মতি বলিবার আবশ্যক করে না। কয়দিনে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সকল একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। জাহাঁগীরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জাহাঁগীর তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সমাদর করিয়া তাঁহার সহোদরের সংবাদ ও পথের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা যাহা মেহের-উন্নিসাকে বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইল। অন্যান্য প্রসঙ্গের পর বর্দ্ধমানের কথা শুনিয়া জাহাঁজীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেহের-উন্নিসার নিকট দুই দিন ছিলে বলিতেছ, মেহের-উন্নিসা আমার কথা কি বলিল?" লুৎফ-উন্নিসা অকপটহৃদয়ে মেহের-উন্নিসার অনুরাগের পরিচয় দিলেন।

বাদশাহ শুনিয়া নীরবে রহিলেন ; তাঁহার বিস্ফারিত লোচনে দুই এক বিন্দু অশ্রু বহিল।

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "জাহাঁপনা ! দাসী শুভ সংবাদ দিয়াছে। দাসীর এখনও কোন পুরস্কারের আদেশ হয় নাই।"

বাদশাহ হাসিয়া কহিলেন, "বিবি ! তোমার আকাঙ্ক্ষা অপরিমিত।"

লু। জাহাঁপনা ! দাসীর কি দোষ ?

বাদ। দিল্লীর বাদশাহকে তোমার গোলাম করিয়া দিয়াছি ; আরও পুরস্কার চাহিতেছ ?

লুৎফ-উন্নিসা হাসিয়া কহিলেন, "স্ত্রীলোকের অনেক সাধ।"

বাদ। আবার কি সাধ হইয়াছে ?

লু। আগে রাজাজ্ঞা হউক যে, দাসীর আবেদন গ্রাহ্য হইবে।

বাদ। যদি রাজকার্য্যে বিঘ্ন না হয়।

লু। (হাসিয়া) একের জন্য দিল্লীশ্বরের কার্য্যের বিঘ্ন হয় না।

বাদ। তবে স্বীকৃত হইলাম ;—সাধটি কি, শুনি।

লু। সাধ হইয়াছে, একটি বিবাহ করিব।

জাহাঁগীর উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "এ নূতনতর সাধ বটে। কোথাও সম্বন্ধের স্থিরতা হইয়াছে ?

লু। তা হইয়াছে। কেবল রাজাজ্ঞার অপেক্ষা। রাজার সম্মতি প্রকাশ না হইলে কোন সম্বন্ধ স্থির নহে।

বাদ। আমার সম্মতির প্রয়োজন কি ? কাহাকে এ সুখের সাগরে ভাসাইবে অভিপ্রায় করিয়াছ ?

লু। দাসী দিল্লীশ্বরের সেবা করিয়াছে বলিয়া দ্বিচারিণী নহে। দাসী আপন স্বামীকেই বিবাহ করিবার অনুমতি চাহিতেছে।

বাদ। বটে ! এ পুরাতন নফরের দশা কি করিবে ?

লু। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসাকে দিয়া যাইব।

বাদ। দিল্লীশ্বরী মেহের-উন্নিসা কে ?

লু। যিনি হইবেন।

জাহাঁগীর মনে ভাবিলেন যে, মেহের-উন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হইবেন, তাহা লুৎফ-উন্নিসা ধ্রুব জানিয়াছেন। তৎকারণে নিজ মনোভিলাষ বিফল হইল বলিয়া রাজাবরোধ হইতে বিরাগে অবসর লইতে চাহিতেছেন।

এইরূপ বুঝিয়া জাহাঁগীর দুঃখিত হইয়া নীরবে রহিলেন। লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "মহারাজের কি এ সম্বন্ধে সম্মতি নাই ?"

বাদ। আমার অসম্মতি নাই। কিন্তু স্বামীর সহিত আবার বিবাহের আবশ্যকতা কি ?

লু। কালক্রমে প্রথম বিবাহে স্বামী পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। এক্ষণে জাহাঁপনার দাসীকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

বাদশাহ রহস্যে হাস্য করিয়া পরে গম্ভীর হইলেন।

কহিলেন, "প্রেয়সি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। তোমার যদি সেই প্রবৃত্তি হয়, তবে তদ্রূপই কর। কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য্য উভয়েই বিরাজ করেন না। এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফোটে না?"

লুৎফ-উন্নিসা বিস্ফারিতচক্ষে বাদশাহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে; কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না। আপনার রত্নসিংহাসনতলে কেন কণ্টক হইয়া থাকিব?

লুৎফ-উন্নিসা আত্মমন্দিরে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার এরূপ মনোবাঞ্ছা যে কেন জন্মিল তাহা তিনি জাহাঁগীরের নিকট ব্যক্ত করেন নাই। অনুভবে যেরূপ বুঝা যাইতে পারে, জাহাঁগীর সেইরূপ বুঝিয়া ক্ষান্ত হইলেন। নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিলেন না। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয় পাষাণ। সেলিমের রমণীহৃদয়জিৎ রাজকান্তিও কখনও তাঁহার মনোমুগ্ধ করে নাই। কিন্তু এইবার পাষাণমধ্যে কীট প্রবেশ করিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আত্মমন্দিরে

"জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু না বুঝনু কৈছন না কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখিনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল ॥
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক ॥"

লুৎফ-উন্নিসা আলয়ে আসিয়া প্রফুল্লবদনে পেষ্‌মন্‌কে ডাকিয়া বেশভূষা পরিত্যাগ করিলেন। স্বর্ণ-মুক্তাদিখচিত বসন পরিত্যাগ করিয়া পেষ্‌মনকে কহিলেন যে, "এই পোষাকটি তুমি লও।"

শুনিয়া পেষ্‌মন্‌ কিছু বিস্ময়াপন্ন হইল। পোষাকটি বহুমূল্যে সম্প্রতিমাত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। কহিল, "পোষাক আমায় কেন? আজিকার কি সংবাদ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিহেন, "শুভ সংবাদ বটে।"

পে। তা ত বুঝিতে পারিতেছি। মেহের-উন্নিসার ভয় কি ঘুচিয়াছে?

লু। ঘুচিয়াছে। এক্ষণে সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই।

পেষ্‌মন্‌ অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তবে এক্ষণে বেগমের দাসী হইলাম।"

লু। যদি তুমি বেগমের দাসী হইতে চাও, তবে আমি মেহের-উন্নিসাকে বলিয়া দিব।

পে। সে কি? আপনি কহিতেছেন যে, মেহের-উন্নিসার বাদশাহের বেগম হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

লু। আমি এমন কথা বলি নাই। আমি বলিয়াছি, সে বিষয়ে আমার কোন চিন্তা নাই।

পে। চিন্তা নাই কেন? আপনি আগ্রার একমাত্র অধীশ্বরী না হইলে যে সকলই বৃথা হইল।

লু। আগ্রার সহিত সম্পর্ক রাখিব না।

পে। সে কি? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আজিকার শুভ সংবাদটা তবে কি, বুঝাইয়া বলুন।

লু। শুভ সংবাদ এই যে, আমি এ জীবনের মত আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম।

পে। কোথায় যাইবেন?

লু। বাঙ্গালায় গিয়া বাস করিব। পারি যদি কোন ভদ্রলোকের গৃহিণী হইব।

পে। এরূপ ব্যঙ্গ নূতন বটে, কিন্তু শুনিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।

লু। ব্যঙ্গ করিতেছি না। আমি সত্য সত্যই আগ্রা ত্যাগ করিয়া চলিলাম। বাদশাহের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছি

পে। এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার কেন জন্মিল?

লু। কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম, কি ফল লাভ হইল? সুখের তৃষ্ণা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষ্ণার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম। কোন্ দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশ্যে এত দূর করিলাম, তাহার কোন্‌টাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলই ত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজি এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, এক দিনের তরেও সুখী হই নাই, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এ সকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরেও সুখী হইতাম। (এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতীয় নির্ঝরিণীর ন্যায় —প্রথমে নির্ম্মল। ক্ষীণধারা বিজনপ্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না; আপনি আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায় তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়। শুধু তাহাই নয়, কখন আবার বায়ু বহে, তরঙ্গ হয়, মকর-কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকতচর মরুভূমি নদীহৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদীশরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায়, কে বলিবে?)

পে। আমি ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন?

লু। কেন হয় না, তা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রসাদের ছায়ায়

বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে একরাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিয়াছি!

পে। কি বুঝিয়াছ?

লু। আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ-রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখন আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকে ভালবাসিয়াছি?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নই ত কি?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন?

লু। মানস ত বটে। সেইজন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে, চুয়াড়ের দেশে যাইবে? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন, তাঁহাকেই কেন ভালবাস না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহের বড় পৃথিবীতে কে আছে?

লু। আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?

পে। কেন?

লু। ললাটলিখন।

লুৎফ-উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না।

পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চরণতলে

"কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে।"

—বীরাঙ্গনা কাব্য।

ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তকোন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্দ্ধহস্ত, একহস্ত, দুইহস্ত পরিমাণ হইল; তথাপি, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না।

দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই,—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে,—চাহি কি, ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম একদিন অকস্মাৎ প্রণয়ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূর্ত্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধর্ম্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম্ম যত অধিক বার করা যায়, সে কর্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়; লুৎফ-উন্নিসা সেই মূর্ত্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহা-প্রবাহও দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসন-লালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত, অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন সকল বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়জন-সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন। সে প্রিয়জন নবকুমার।

এই জন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এই জন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদরক্ষায় কোন যত্ন পাইলেন না; এই জন্যই জন্মের মত বাদশাহের নিকট বিদায় লইলেন।

লুৎফ-উন্নিসা সপ্তগ্রামে আসিলেন। রাজপথের অনতিদূরে নগরীর মধ্যে এক অট্টালিকায় আপন বাসস্থান করিলেন। রাজপথের পথিকেরা দেখিলেন, অকস্মাৎ এই অট্টালিকা সুবর্ণ-খচিত বসনভূষিত দাসদাসীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। কক্ষায় কক্ষায় হর্ম্ম্যশয্যা অতি মনোহর। গন্ধদ্রব্য, গন্ধ বারি, কুসুমদাম সর্ব্বত্র আমোদ করিতেছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, গজদন্তাদি-খচিত গৃহশোভার্থ নানাদ্রব্য সকল স্থানেই আলো করিতেছে। এইরূপ সজ্জীভূত এক কক্ষায় লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে বসিয়া আছেন। পৃথগাসনে নবকুমার বসিয়া আছেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সহিত লুৎফ-উন্নিসার আর দুই একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল; তাহাতে লুৎফ-উন্নিসার মনোরথ কতদূর সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অদ্যকার কথায় প্রকাশ হইবে।

নবকুমার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিলেন, "তবে আমি এক্ষণে চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য, তাহা সমাপ্ত করি নাই।"

নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি বলিবে?" লুৎফ-উন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধৃত করিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি বল না?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব, কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরবও চাহি না, কেবল দাসী।"

নবকুমার কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ্ লইয়া যবনী-জার হইতে পারিব না।"

যবনী-জার!—নবকুমার এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই যে, এই রমণী তাঁহার পত্নী। লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাঁহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা আবার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন, "ভাল, সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাই না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও, দাসী ভাবিয়া এক একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষু পরিতৃপ্তি করিব।"

নব। তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

ক্ষণেক নীরব। লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে ঝটিকা বহিতেছিল। প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দ রহিলেন। নবকুমারের বস্ত্রাগ্রভাগ ত্যাগ করিলেন। কহিলেন, "যাও।"

নবকুমার চলিলেন। দুই চারি পদ চলিয়াছিলেন মাত্র, সহসা লুৎফ-উন্নিসা বাতোন্মূলিত পাদপের ন্যায় তাঁহার পদতলে পড়িলেন। বাহু-লতায় চরণযুগল বদ্ধ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "নির্দ্দয়! আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও, আমার আশা ত্যাগ কর।"

এ জন্মে নহে! লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন, "এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।" মস্তক উন্নত করিয়া ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া নবকুমারের মুখপ্রতি অনিমেষ আয়ত চক্ষুঃ স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাঁড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল; যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্য শাসন-কল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্ব্বলদেহে সঞ্চারিত হইল। ললাটদেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীয় রেখা দেখা দিল; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুঃ রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল; নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল। স্রোতোবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "এজন্মে না তুমি আমারই হইবে।"

সেই কুপিতফণিনীমূর্ত্তি প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসার অনির্ব্বচনীয় দেহমহিমা এখনও যেরূপ দেখিতে পাইলেন, সেরূপ আর কখনও দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী, দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্ত্তি মনে

পড়িল। একদিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল; এমনই ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল, এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল। বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল।

সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি কে?"

যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, "আমি পদ্মাবতী।"

উত্তর-প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফ-উন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া, আপন আলয়ে গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উপনগর-প্রান্তে

"—I am settled, and bend up
Each corporal agent to this terrible feat."
—Macbeth.

কক্ষান্তরে গিয়া লুৎফ-উন্নিসা দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দুই দিন পর্য্যন্ত সেই কক্ষ হইতে নির্গত হইলেন না। এই দুই দিনে তিনি নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। স্থির করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। সূর্য অস্তাচলগামী। তখন লুৎফ-উন্নিসা পেষ্‌মনের সাহায্যে বেশভূষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য বেশভূষা। পেষওয়াজ নাই—পায়জামা নাই—ওড়না নাই; রমণীবেশের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। যে বেশভূষা করিলেন, তাহা মুকুরে দেখিয়া পেষ্‌মনকে কহিলেন, "কেমন পেষ্‌মন, আর আমাকে চেনা যায়?

পেষ্‌মন্ কহিল "কার সাধ্য?"

লু। তবে আমি চলিলাম। আমার সঙ্গে যেন কোন দাস-দাসী না যায়।

পেষ্‌মন্ কিছু সঙ্কুচিতচিত্তে কহিল, "যদি দাসীর অপরাধ ক্ষমা করেন, তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "কি?"

পেষ্‌মন্ কহিল, "আপনার উদ্দেশ্য কি?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "আপাততঃ কপালকুণ্ডলার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ। পরে তিনি আমার হইবেন।"

পে। বিবি! ভাল করিয়া বিবেচনা করুন; সে নিবিড় বন, রাত্রি আগত; আপনি একাকিনী।

লুৎফ উন্নিসা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন।

সপ্তগ্রামের যে জনহীন বনময় উপনগ প্রান্তে নবকুমারের বসতি, সেইদিকে চলিলেন। তৎপ্রদেশে উপনীত হইতে রাত্রি হইয়া আসিল। নবকুমারের বাটীর অনতিদূরে এক নিবিড় বন আছে, পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারে। তাহারই প্রান্তভাগে উপনীত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। কিছুকাল বসিয়া যে দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁহার অননুভূত-পূর্ব্ব সহায় উপস্থিত হইল।

লুৎফ-উন্নিসা যথায় বসিয়াছিলেন, তথা হইতে এক অনবরত সমানোচ্চারিত মনুষ্য-কণ্ঠনির্গত শব্দ শুনিতে পাইলেন। উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন যে, বনমধ্যে একটি আলো দেখা যাইতেছে। লুৎফ-উন্নিসা সাহসে পুরুষের অধিক, যথায় আলো জ্বলিতেছে, সেই স্থানে গেলেন। প্রথমে বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, ব্যাপার কি? দেখিলেন যে, যে আলো জ্বলিতেছিল, সে হোমের আলো; যে শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন, সে মন্ত্রপাঠের শব্দ। মন্ত্রমধ্যে একটি শব্দ বুঝিতে পারিলেন, সে একটি নাম। নাম শুনিবামাত্র লুৎফ-উন্নিসা হোমকারীর নিকটে গিয়া বসিলেন।

এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন, পাঠক মহাশয় বহুকাল কপালকুণ্ডলার কোন সংবাদ পান নাই, সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

শয়নাগারে

"রাধিকার বেড়ি ভাঙ্গ, এ মম মিনতি।"

—ব্রজাঙ্গনা কাব্য।

লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা-গমন করিতে এবং তথা হইতে সপ্তগ্রাম আসিতে প্রায় এক বৎসর গত হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা এক বৎসরের অধিককাল নবকুমারের গৃহিণী। যে দিন প্রদোষকালে লুৎফ-উন্নিসা কাননে, সে দিন কপালকুণ্ডলা অন্যমনে শয়নকক্ষে বসিয়া আছেন। পাঠক মহাশয় সমুদ্রতীরে আলুলায়িতকুণ্ডলা, ভূষণহীনা যে কপাল-কুণ্ডলা দেখিয়াছিলেন, এ সে কপালকুণ্ডলা নহে। শ্যামাসুন্দরীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে; স্পর্শমণির স্পর্শে যোগিনী গৃহিণী হইয়াছে, এক্ষণে সেই অসংখ্য কৃষ্ণোজ্জল, ভুজঙ্গের বূ্যহতুল্য আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশির পশ্চাদ্ভাগে স্থূলবেণী সংবদ্ধ হইয়াছে। বেণীরচনারও শিল্পপরিপাট্য লক্ষিত হইতেছে, কেশবিন্যাসে অনেক সূক্ষ্ম কারুকার্য্য শ্যামাসুন্দরীর বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। কুসুমদামও পরিত্যক্ত হয় নাই, চতুষ্পার্শ্বে কিরীটমণ্ডলস্বরূপ বেণী বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কেশের যে ভাগ বেণীমধ্যে ন্যস্ত হয় নাই, তাহা যে শিরোপরি সর্ব্বত্র সমানোচ্চ হইয়া রহিয়াছে, এমত নহে। আকুঞ্চন প্রযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণতরঙ্গলেখায় শোভিত হইয়া রহিয়াছে। মুখমণ্ডল এখন আর কেশভারে অর্দ্ধলুক্কায়িত নহে; জ্যোতির্ম্ময় হইয়া শোভা পাইতেছে; কেবলমাত্র স্থানে স্থানে বন্ধনবিস্রংসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলকাগুচ্ছ তদুপরি স্বেদবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বর্ণ সেই অর্দ্ধপূর্ণশশাঙ্করশ্মিরুচির। এখন দুই কর্ণে হেমকর্ণভূষা দুলিতেছে; কণ্ঠে হিরন্ময় কণ্ঠমালা দুলিতেছে। বর্ণের নিকট সে সকল ম্লান হয় নাই, অর্দ্ধচন্দ্রকৌমুদী-বসনা ধরণীর অঙ্গে নৈশ কুসুমবৎ শোভা পাইতেছে। তাঁহার পরিধানে শুক্লাম্বর অর্দ্ধচন্দ্রদীপ্ত আকাশমণ্ডলে অনিবিড় শুক্ল মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

বর্ণ সেইরূপ চন্দ্রার্দ্ধকৌমুদীময় বটে, কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা ঈষৎ সমল, যেন আকাশপ্রান্তে কোথা কাল মেঘ দেখা দিয়াছে। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বসিয়া ছিলেন না; সখী শ্যামাসুন্দরী নিকটে বসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের উভয়ের পরস্পরের কথোপকথন হইতেছিল। তাহার কিয়দংশ পাঠক মহাশয়কে শুনিতে হইবে।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "ঠাকুরজামাই আর কতদিন এখানে থাকিবেন?"

শ্যামা কহিলেন, "কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজ রাত্রে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?"

ক। দিনে তুলিলে কেন হয় না?

শ্যা। দিনে তুলিলে ফলবে কেন? ঠিক দুই প্রহর রাত্রে এলোচুলে তুলিতে হয়; তা ভাই মনের সাধ মনেই রইল।

ক। আচ্ছা, আমি ত আজ দিনে সে গাছ চিনে এসেছি, আর যে বনে হয়, তাও দেখে এসেছি। তোমাকে আজি আর যেতে হবে না, আমি একা গিয়া ঔষধ তুলিয়া আনিব।

শ্যা। এক দিন যা হইয়াছে, তা হইয়াছে। রাত্রে তুমি আর বাহির হইও না।

ক। সে জন্য কেন তুমি চিন্তা কর? শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস। মনে ভেবে দেখ, যদি আমার সে অভ্যাস না থাকিত, তবে তোমার সঙ্গে আমার কখনও চাক্ষুষ হইত না।

শ্যা। সে ভয়ে বলি না, কিন্তু একা রাত্রে বনে বনে বেড়ান কি গৃহস্থের বউ-ঝির ভাল? দুই জনে গিয়াও এত তিরস্কার খাইলাম, তুমি একাকিনী গেলে কি রক্ষা থাকিবে?

ক। ক্ষতিই কি? তুমি কি মনে করিয়াছ যে, আমি রাত্রে ঘরের বাহির হইলেই কুচরিত্রা হইব?

শ্যা। আমি তা মনে করি না। কিন্তু মন্দ লোকে মন্দ বলবে।

ক। বলুক, আমি তাতে মন্দ হব না।

শ্যা। তা ত হবে না—কিন্তু তোমাকে কেহ কিছু মন্দ বলিলে আমাদিগের অন্তঃকরণে ক্লেশ হবে।

ক। এমন অন্যায় ক্লেশ হইতে দিও না।

শ্যা। তাও আমি পারিব। কিন্তু দাদাকে কেন অসুখী করিবে?

কপালকুণ্ডলা শ্যামাসুন্দরীর প্রতি নিজ স্নিগ্ধোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, "ইহাতে তিনি অসুখী হয়েন আমি কি করিব? যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।"

ইহার পর আর কথা শ্যামাসুন্দরী ভাল বুঝিলেন না, আত্মকর্ম্মে উঠিয়া গেলেন।

কপালকুণ্ডলা প্রয়োজনীয় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া ঔষধির অনুসন্ধানে গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। তখন রাত্রি প্রহরাতীত হইয়াছিল। নিশা সজ্যোৎস্না। নবকুমার বহিঃকক্ষায় বসিয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা যে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তাহা গবাক্ষপথে দেখিতে পাইলেন। তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া মৃন্ময়ীর হাত ধরিলেন। কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি?"

নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ?" নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনামাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।"

নবকুমার পূর্ব্ববৎ কোমলস্বরে কহিলেন, "ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে? আজি আবার কেন?"

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই, আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুভাবে কহিলেন, "ভাল, দিনে খুঁজিলেও ত হয়?" নবকুমারের স্বর স্নেহপরিপূর্ণ।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "দিবসে ঔষধ ফলে না।"

নব। কাজ কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ঔষধ তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকে এলোচুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারের বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, "আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।"

নবকুমার আর কিছু বলিতে পারিলেন না। নিশ্বাস সহকারে কপালকুণ্ডলার হাত ছাড়িয়া দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাননতলে

"———Tender is the night,
And haply the Queen moon is on her throne,
Clustered around by all her starry fays,
But here there is no light."

—Keats.

সপ্তগ্রামের এই ভাগ যে বনময়, তাহা পূর্ব্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রামের কিছু দূরে নিবিড় বন। কপালকুণ্ডলা একাকিনী এক সঙ্কীর্ণ বন্য পথে ঔষধির সন্ধানে চলিলেন। যামিনী মধুরা, একান্ত, শব্দমাত্রবিহীনা। মাধবী যামিনীর আকাশে স্নিগ্ধরশ্মিময় চন্দ্র নীরবে শ্বেত মেঘখণ্ডসকল উত্তীর্ণ হইতেছে; পৃথিবীতলে বন্য বৃক্ষলতাসকল তদ্রূপ নীরবে শীতল চন্দ্রকরে বিশ্রাম করিতেছে, নীরবে বৃক্ষপত্রসকল সে কিরণের প্রতিঘাত করিতেছে, নীরবে লতা-গুল্মমধ্যে শ্বেত কুসুমদল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। পশু-পক্ষী নীরব। কেবল কোথাও কদাচিৎমাত্র ভগ্নবিশ্রাম কোন পক্ষীর পক্ষস্পন্দনশব্দ, কোথাও ক্বচিৎ শুষ্কপত্রপাতশব্দ, কোথাও তলস্থ শুষ্কপত্রমধ্যে উরগ-জাতীয় জীবের ক্বচিৎ গতিজনিত শব্দ, ক্বচিৎ অতি দূরস্থ কুকুররব। এমন নহে যে, একেবারে বায়ু বহিতে ছিল না, মধুমাসের দেহস্নিগ্ধকর বায়ু। অতিমন্দ; একান্ত

নিঃশব্দ বায়ুমাত্র ; তাহাতে কেবলমাত্র বৃক্ষের সর্ব্বাগ্রভাগারূঢ় পত্রগুলি হেলিতেছিল ; কেবলমাত্র আভূমিপ্রণত শ্যামালতা দুলিতেছিল ; কেবলমাত্র নীলাম্বরসঞ্চারী ক্ষুদ্র শ্বেতাম্বুদখণ্ডগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। কেবলমাত্র তদ্রূপ বায়ুসংসর্গে সম্ভুক্ত পূর্ব্ব-সুখের অস্পষ্ট স্মৃতি হৃদয়ে অল্প জাগরিত হইতেছিল।

কপালকুণ্ডলার সেইরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল ; বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগরবারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল, অমল নীলানন্ত গগনপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন ; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।

অন্যমনে যাইতে যাইতে কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, কপালকুণ্ডলা তাহা ভাবিলেন না। যে পথে যাইতেছিলেন, তাহা ক্রমে অগম্য হইয়া আসিল। বন নিবিড়তর হইল ; শিরোপরি বৃক্ষশাখাবিন্যাসে চন্দ্রালোক প্রায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া আসিল ; ক্রমে আর পথ দেখা যায় না। পথের অলক্ষ্যতায় প্রথমে কপালকুণ্ডলা চিন্তামগ্নতা হইতে উত্থিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, এই নিবিড় বনমধ্যে আলো জ্বলিতেছে। লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্বে এই আলো দেখিয়াছিলেন। কপাল-কুণ্ডলা পূর্ব্বাভ্যাসফলে এ সকল সময়ে ভয়হীন অথচ কৌতূহলময়ী। ধীরে ধীরে সেই দীপজ্যোতির অভিমুখে গেলেন। দেখিলেন, যথায় আলো জ্বলিতেছে, তথায় কেহ নাই, কিন্তু তাহার অনতিদূরে বননিবিড়তাহেতু দূর হইতে অদৃশ্য একটি ভগ্নগৃহ আছে। গৃহটি ইষ্টকনির্ম্মিত, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র, অতি সামান্য ; তাহাতে একটি মাত্র ঘর। সেই ঘর হইতে মনুষ্যকথোপকথনশব্দ নির্গম হইতেছিল। কপালকুণ্ডলা নিঃশব্দপদক্ষেপে গৃহসন্নিধানে গেলেন। গৃহের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র বোধ হইল, দুই জন মনুষ্য সাবধানে কথোপকথন করিতেছে। প্রথমে কথোপকথন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পরে ক্রমে চেষ্টাজনিত কর্ণের তীক্ষ্ণতা জন্মিলে নিম্নলিখিত মত কথা শুনিতে পাইলেন।

এক জন কহিতেছে, "আমার অভীষ্ট মৃত্যু, ইহাতে তোমার অভিমত না হয়, আমি তোমার সাহায্য করিব না ; তুমিও আমার সহায়তা করিও না।"

অপর ব্যক্তি কহিল, "আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি ; কিন্তু যাবজ্জীবন জন্য ইহার নির্ব্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না ; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।"

প্রথমালাপকারী কহিল, "তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করিতেছি,। মনঃসংযোগ করিয়া শ্রবণ কর। অতি গূঢ় বৃত্তান্ত বলিব। চতুর্দ্দিক্ একবার দেখিয়া আইস, যেন মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইতেছি।"

বাস্তবিক কপালকুণ্ডলা কথোপকথন উত্তমরূপে শুনিবার জন্য কক্ষ-প্রাচীরের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয় ও শঙ্কার কারণে ঘন ঘন গুরুশ্বাস বহিতেছিল।

সমভিব্যাহারীর কথায় গৃহমধ্যে এক ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন এবং আসিয়াই কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে পাইলেন। কপালকুণ্ডলাও পরিষ্কার চন্দ্রালোকে আগন্তুক পুরুষের অবয়ব সুস্পষ্ট করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া ভীতা হইবেন, কি প্রফুল্লিতা

হইবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আগন্তুক ব্রাহ্মণবেশী ; সামান্য ধুতি পরিধান ; গাত্র উত্তমরূপে আচ্ছাদিত। ব্রাহ্মণকুমার অতি কোমলবয়স্ক ; মুখ-মণ্ডলে বয়শ্চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। মুখখানি পরম সুন্দর, সুন্দরী রমণীমুখের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু রমণীদুর্ল্লভ-তেজোগর্ব্ববিশিষ্ট। তাঁহার কেশগুলি সচরাচর পুরুষদিগের কেশের ন্যায় ক্ষৌরকার্য্য-বিশেষাত্মক মাত্র নহে, স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অচ্ছিন্নাবস্থায় উত্তরীয় প্রচ্ছন্ন করিয়া পৃষ্ঠদেশে, অংসে, বাহুদেশে, কদাচিৎ বক্ষে সংসর্পিত হইয়া পড়িয়াছে। ললাট প্রশস্ত, স্ফীত, মধ্যস্থলে একমাত্র শিরাপ্রকাশশোভিত। চক্ষু দুটি বিদ্যুত্তেজঃ-পরিপূর্ণ। কোষশূন্য এক দীর্ঘ তরবারি হস্তে ছিল। কিন্তু এ রূপরাশিমধ্যে এক ভীষণ ভাব ব্যক্ত হইতেছিল। হেমকান্ত বর্ণে যেন কোন করাল কামনার ছায়া পড়িয়াছিল। অন্তস্তল পর্য্যন্ত অন্বেষণক্ষম কটাক্ষ দেখিয়া কপালকুণ্ডলার ভীতি সঞ্চার হইল।

উভয়ে উভয়ের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে কপালকুণ্ডলা নয়নপল্লব নিক্ষিপ্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলা নয়ন-পল্লব নিক্ষিপ্ত করাতে আগন্তুক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে ?"

যদি এক বৎসর পূর্ব্বে হিজলীর কিয়াবনে কপালকুণ্ডলার প্রতি এ প্রশ্ন হইত, তবে তিনি তৎক্ষণেই সঙ্গত উত্তর দিতেন। কিন্তু এখন কপালকুণ্ডলা কতকদূর গৃহরমণীর স্বভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, সুতরাং সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে নিরুত্তরা দেখিয়া গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলেন, "কপালকুণ্ডলা! তুমি এ রাত্রে নিবিড় বনমধ্যে কি জন্য আসিয়াছ ?"

অজ্ঞাত রাত্রিচর পুরুষের মুখে আপন নাম শুনিয়া কপালকুণ্ডলা অবাক্ হইলেন, কিছু ভীতাও হইলেন। সুতরাং সহসা কোন উত্তর তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

ব্রাহ্মণবেশী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছ ?"

সহসা কপালকুণ্ডলা বাক্‌শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি উত্তর না দিয়া কহিলেন, "আমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ কাননমধ্যে তোমরা দুই জনে এ নিশীথে কি কুপরামর্শ করিতেছিলে ?"

ব্রাহ্মণবেশী কিছুকাল নিরুত্তরে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। যেন কোন নূতন ইষ্টসিদ্ধির উপায় তাঁহার চিত্তমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি কপালকুণ্ডলার হস্তধারণ করিলেন এবং হস্ত ধরিয়া ভগ্ন গৃহ হইতে কিছু দূরে লইয়া যাইতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা অতি ক্রোধে হস্ত মুক্ত করিয়া লইলেন। ব্রহ্মণবেশী অতি মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলার কানের কাছে কহিলেন, "চিন্তা কি ? আমি পুরুষ নহি।"

কপালকুণ্ডলা আরও চমৎকৃতা হইলেন। এ কথায় তাঁহার কতক বিশ্বাস হইল, সম্পূর্ণ বিশ্বাসও হইল না। তিনি ব্রাহ্মণবেশধারিণীর সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। ভগ্ন গৃহ হইতে অদৃশ্য স্থানে গিয়া ব্রাহ্মণবেশী কপালকুণ্ডলাকে কর্ণে কর্ণে কহিলেন, "আমরা যে কুপরামর্শ করিতেছিলাম, তাহা শুনিবে ? সে তোমারই সম্বন্ধে।"

কপালকুণ্ডলার ভয় এবং আগ্রহ অতিশয় বাড়িল। কহিলেন, "শুনিব।"

ছদ্মবেশী কহিলেন, "তবে যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, ততক্ষণ এইস্থানে প্রতীক্ষা কর।"

এই বলিয়া ছদ্মবেশী ভগ্নগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; কপালকুণ্ডলা কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অতি উৎকট ভয় জন্মিয়াছিল। এক্ষণে একাকিনী অন্ধকার বনমধ্যে বসিয়া থাকিতে আরও ভয় বাড়িতে লাগিল। বিশেষ এই ছদ্মবেশী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে তথায় বসাইয়া রাখিয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে ? হয় ত সুযোগ পাইয়া আপনার মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্যই বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। এইরূপ আলোচনা করিয়া কপালকুণ্ডলা ভীতি-বিহ্বলা হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মবেশীর প্রত্যাগমনে অনেক বিলম্ব হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর বসিতে পারিলেন না ; উঠিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

তখন আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া আসিতে লাগিল, কাননতলে যে সামান্য আলো ছিল, তাহাও অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারিলেন না। শীঘ্রপদে কাননাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময় যেন পশ্চাদ্ভাগে অপর ব্যক্তির পদক্ষেপধ্বনি শুনিতে পারিলেন। কিন্তু মুখ ফিরাইয়া অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইলেন না। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, ব্রাহ্মণবেশী তাঁহার পশ্চাৎ আসিতেছেন। বনত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষুদ্র বনপথে আসিয়া বাহির হইলেন। তথায় তাদৃশ অন্ধকার নহে ; দৃষ্টিপথে মনুষ্য থাকিলে দেখা যায়। কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। অতএব দ্রুতপদে চলিলেন, কিন্তু আবার স্পষ্ট মনুষ্যগতিশব্দ শুনিতে পাইলেন। আকাশ নীলকাদম্বিনীতে ভীষণতর হইল। কপালকুণ্ডলা আরও দ্রুত চলিলেন। গৃহ অনতিদূরে, কিন্তু গৃহপ্রাপ্তি হইতে না হইতেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি ভীষণরবে প্রঘোষিত হইল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িলেন। পশ্চাতে যে আসিতেছিল, সেও যেন দৌড়িল, এমন শব্দ বোধ হইল। গৃহ দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি কপালকুণ্ডলার মস্তকের উপর দিয়া প্রধাবিত হইল। ঘন ঘন গম্ভীর মেঘশব্দ এবং অশনিসম্পাতশব্দ হইতে লাগিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা কোনক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া গৃহে আসিলেন। প্রাঙ্গণভূমি পার হইয়া প্রকোষ্ঠমধ্যে উঠিলেন। দ্বার তাঁহার জন্য খোলা ছিল। দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য প্রাঙ্গণের দিকে সম্মুখ ফিরিলেন। বোধ হইল যেন প্রাঙ্গণ-ভূমিতে এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়ে একবার বিদ্যুৎ চমকিল। একবার বিদ্যুতেই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সে সাগরতীরপ্রবাসী সেই কাপালিক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে

"I had a dream, which was not at all a dream."

—Byron.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। ধীরে ধীরে শয়নাগারে আসিলেন, ধীরে ধীরে পালঙ্কে শয়ন করিলেন। মনুষ্যহৃদয় অনন্ত সমুদ্র, যখন তদুপরি ক্ষিপ্ত বায়ুগণ

সমর করিতে থাকে, কে তাহার তরঙ্গমালা গণিতে পারে? কপালকুণ্ডলার হৃদয়সমুদ্রে যে তরঙ্গমালা উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, কে তাহা গণিবে?)

সে রাত্রে নবকুমার হৃদয়বেদনায় অন্তঃপুরে আইসেন নাই। শয়নাগারে একাকিনী কপালকুণ্ডলা শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। প্রলয়বায়ুতাড়িত বারিধারা-পরিষিক্তি জটাজূটবেষ্টিত সেই মুখমণ্ডল অন্ধকারমধ্যেও চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন, কপালকুণ্ডলা পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, কাপালিকের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়া তিনি চলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; কাপালিক নিবিড় বনমধ্যে যে সকল পৈশাচিক কার্য্য করিতেন, তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; তৎকৃত ভৈরবীপূজা, নবকুমারের বন্ধন, এ সকল মনে পড়িতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা শিহরিয়া উঠিলেন। অদ্যকার রাত্রের সকল ঘটনাও মনোমধ্যে আসিতে লাগিল। শ্যামার ঔষধিকামনা, নবকুমারের নিষেধ, তাঁহার প্রতি কপালকুণ্ডলার তিরস্কার, তৎপরে অরণ্যের জ্যোৎস্নাময়ী শোভা, কাননতলে অন্ধকার, সেই অরণ্যমধ্যে যে সহচর পাইয়াছিলেন, তাহার ভীমকান্তগুণময় রূপ; সকলই মনে পড়িতে লাগিল।

পূর্ব্বদিকে উষার মুকুটজ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; তখন কপালকুণ্ডলার অল্প তন্দ্রা আসিল। সেই অপ্রগাঢ় নিদ্রায় কপালকুণ্ডলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি যেন সেই পূর্ব্বদৃষ্ট সাগরহৃদয়ে তরণী আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। তরণী সুশোভিত; তাহাতে বসন্তরঙ্গের পতাকা উড়িতেছে; নাবিকেরা ফুলের মালা গলায় দিয়া বাহিতেছে। রাধাশ্যামের অনন্ত প্রণয়গীত করিতেছে। পশ্চিমগগন হইতে সূর্য্য স্বর্ণধারা বৃষ্টি করিতেছে। স্বর্ণধারা পাইয়া সমুদ্র হাসিতেছে; আকাশমণ্ডলে মেঘগণ সেই স্বর্ণবৃষ্টিতে ছুটাছুটি করিয়া স্নান করিতেছে। অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য্য কোথায় গেল। স্বর্ণমেঘ সকল কোথায় গেল। নিবিড় নীলকাদম্বিনী আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল। আর সমুদ্রে দিক্‌নিরূপণ হয় না। নাবিকেরা তরী ফিরাইল। কোন্ দিকে বাহিবে, স্থিরতা পায় না। তাহারা গীত বন্ধ করিল, গলার মালা সকল ছিঁড়িয়া ফেলিল। বসন্তরঙ্গের পতাকা আপনি খসিয়া জলে পড়িয়া গেল! বাতাস উঠিল; বৃক্ষপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, তরঙ্গমধ্য হইতে এক জন জটাজূটধারী প্রকাণ্ডকার পুরুষ আসিয়া কপালকুণ্ডলার নৌকা বামহস্তে তুলিয়া সমুদ্রমধ্যে প্রেরণ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময়ে সেই ভীমকান্তশ্রীময় ব্রাহ্মণবেশধারী আসিয়া তরী ধরিয়া রহিল। সে কপালকুণ্ডলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমায় রাখি কি নিমগ্ন করি?" অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার মুখ হইতে বাহির হইল, "নিমগ্ন কর।" ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছাড়িয়া দিল। তখন নৌকাও শব্দময়ী হইল, কথা কহিয়া উঠিল। নৌকা কহিল, "আমি আর এ ভার বহিতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি।" ইহা কহিয়া নৌকা তাহাকে জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।

ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হইয়া কপালকুণ্ডলা স্বপ্নোত্থিতা হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; দেখিলেন, প্রভাত হইয়াছে, কক্ষার গবাক্ষ মুক্ত রহিয়াছে, তন্মধ্য দিয়া বসন্তবায়ুস্রোতঃ প্রবেশ করিতেছে। মন্দান্দোলিত বৃক্ষশাখায় পক্ষিগণ কূজন করিতেছে। সেই গবাক্ষের উপর কতকগুলি মনোহর বন্যলতা সুবাসিত কুসুমসহিত দুলিতেছে।

কপালকুণ্ডলা নারীস্বভাববশতঃ লতাগুলি গুছাইয়া লইতে লাগিলেন। তাহা সুশৃঙ্খল করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার মধ্য হইতে একখানি লিপি বাহির হইল। কপালকুণ্ডলা অধিকারীর ছাত্র, পড়িতে পারিতেন। নিম্নোক্তমত পাঠ করিলেন—

"অদ্য সন্ধ্যার পর কল্য রাত্রের ব্রাহ্মণকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবা। তোমার নিজ সম্পর্কীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে, তাহা শুনিবে।

অহং ব্রাহ্মণবেশী।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কৃতসঙ্কেতে

"———I will have grounds more relative than this."

—Hamlet.

কপালকুণ্ডলা সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনন্যচিন্তা হইয়া কেবল ইহাই বিবেচনা করিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মণবেশীর সহিত সাক্ষাৎ বিধেয় কি না। পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জ্জনে অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ যে অবিধেয় ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে সঙ্কোচ জন্মে নাই; তদ্বিষয়ে তাঁহার স্থিরসিদ্ধান্তই ছিল যে, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য দূষ্য না হইলে এমন সাক্ষাতে দোষ নাই—পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে যেরূপ সাক্ষাতের অধিকার, স্ত্রী-পুরুষে সাক্ষাতের উভয়েরই সেইরূপ অধিকার উচিত বলিয়া তাঁহার বোধ ছিল; বিশেষ ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ কি না, তাহাতে সন্দেহ। সুতরাং সে সঙ্কোচ অনাবশ্যক; কিন্তু এ সাক্ষাতে মঙ্গল কি অমঙ্গল জন্মিবে, তাহাই অনিশ্চিত বলিয়া কপালকুণ্ডলা এতদূর সঙ্কোচ করিতেছিলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণবেশীর কথোপকথন, পরে কাপালিকের দর্শন, তৎপরে স্বপ্ন, এই সকল হেতুতে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে আত্মসম্বন্ধে মহাভীতি-সঞ্চার হইয়াছিল। নিজ অমঙ্গল যে অদূরবর্ত্তী, এমত সন্দেহ প্রবল হইয়াছিল। সেই অমঙ্গল যে কাপালিকের আগমনসহিত সম্বন্ধমিলিত, এমত সন্দেহও অমূলক বোধ হইল না। এই ব্রাহ্মণবেশীকে তাঁহারই সহচর বোধ হইতেছে—অতএব তাহার সহিত সাক্ষাতে সেই আশঙ্কার বিষয়ীভূত অমঙ্গলে পতিতও হইতে পারেন। সে ত স্পষ্টই বলিয়াছে যে, কপালকুণ্ডলা-সম্বন্ধেই পরামর্শ হইতেছিল। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, ইহা হইতে তন্নিরাকরণ-সূচনা হইবে। ব্রাহ্মণকুমার এক ব্যক্তির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিল, সে ব্যক্তিকে এই কাপালিক বলিয়া বোধ হয়। সেই কথোপকথনে কাহারও মৃত্যুর সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছিল, নিতান্ত পক্ষে চিরনির্ব্বাসন। সে কাহার? ব্রাহ্মণবেশী ত স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই কুপরামর্শ হইতেছিল। তবে তাহারই মৃত্যু বা তাহারই চিরনির্ব্বাসনকল্পনা হইতেছিল। তবে যখন এই সকল ভীষণ অভিসন্ধিতে ব্রাহ্মণবেশী সহকারী, তখন তাহার নিকট রাত্রিকালে একাকিনী দুর্গম কাননে গমন করা কেবল বিপদেরই কারণ হইতে পারে। কিন্তু কালি রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; সে স্বপ্ন;—

সে স্বপ্নের তাৎপর্য্য কি? স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী মহাবিপত্তিকালে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ফলিতেছে! ব্রাহ্মণবেশী সকল ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন; তিনি স্বপ্নে বলিয়াছিলেন, "নিমগ্ন কর," কার্য্যেও কি সেইরূপ বলিবেন? ব্রাহ্মণবেশীর সাহায্য ত্যাগ করিয়া বিপৎসাগরে ডুবিবেন? না—না,—ভক্তবৎসলা ভবানী অনুগ্রহ করিয়া স্বপ্নে তাঁহার রক্ষাহেতু উপদেশ দিয়াছেন, ব্রাহ্মণবেশী আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে চাহিতেছেন; তাঁহার সাহায্য ত্যাগ করিলে নিমগ্ন হইবেন। অতএব কপালকুণ্ডলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন। বিজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন কি না, তাহাতে সন্দেহ; কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্তের সহিত আমাদিগের সংস্রব নাই। কপালকুণ্ডলা বিশেষ বিজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতূহলপরবশ রমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভীমকান্ত রূপরাশিদর্শন-লোলুপ যুবতীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, নৈশবন-ভ্রমণবিলাসিনী সন্ন্যাসিপালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, ভবানী-ভক্তিভাব-বিমোহিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন, জ্বলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।

সন্ধ্যার পরে গৃহকর্ম্ম কতক কতক সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা পূর্ব্বমত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কপালকুণ্ডলা যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্বল করিয়া গেলেন। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন, অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।

যাত্রাকালে কপালকুণ্ডলা এক কথা বিস্মৃত হইলেন। ব্রাহ্মণবেশী কোন্ স্থানে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছেন? এই জন্য পুনর্ব্বার লিপিপাঠের আবশ্যক হইল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যে স্থানে প্রাতে লিপি রাখিয়াছিলেন, সে স্থানে অন্বেষণ করিলেন, সে স্থানে লিপি পাইলেন না। স্মরণ হইল যে, কেশবন্ধন-সময়ে ঐ লিপি সঙ্গে সঙ্গে রাখিবার জন্য কবরীমধ্যে বিন্যস্ত করিয়াছিলেন। অতএব কবরীমধ্যে অঙ্গুলী দিয়া সন্ধান করিলেন। অঙ্গুলীতে লিপি স্পর্শ না হওয়াতে কবরী আলুলায়িত করিলেন, তথাপি যে লিপি পাইলেন না। তখন গৃহের অন্যান্য স্থানে তত্ত্ব করিলেন। কোথাও না পাইয়া পরিশেষে পূর্ব্বসাক্ষাৎস্থানেই সাক্ষাৎ সম্ভব সিদ্ধান্ত করিয়া পুনর্যাত্রা করিলেন। অনবকাশপ্রযুক্ত সে বিশাল কেশরাশি পুনর্বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই, অতএব আজি কপালকুণ্ডলা অনূঢ়াকালের মত কেশমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী হইয়া চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গৃহদ্বারে

"Stand you awhile apart,
Confine yourself but in a patient list."

—Othello.

যখন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কপালকুণ্ডলা গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা ছিলেন, তখন লিপি কবরী-বন্ধনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গিয়াছিল। কপালকুণ্ডলা তাহা জানিতে পারেন

নাই। নবকুমার তাহা দেখিয়াছিলেন। কবরী হইতে পত্র খসিয়া পড়িল দেখিয়া নবকুমার বিস্মিত হইলেন। কপালকুণ্ডলা কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলে লিপি খুলিয়া বাহিরে গিয়া পাঠ করিলেন ; সে লিপি পাঠ করিয়া একই সিদ্ধান্ত সম্ভবে। "যে কথা কাল শুনিতে চাহিয়াছিলে, সে কথা শুনিবে ?" সে কি ? প্রণয়-কথা ; ব্রাহ্মণবেশী মৃন্ময়ীর উপপতি ; যে ব্যক্তি পূর্ব্বরাত্রের বৃত্তান্ত অনবগত, তাহার পক্ষে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভবে না।

পতিব্রতা, স্বামীর সহগমনকালে অথবা অন্য কারণে যখন কেহ জীবিতে চিতারোহণ করিয়া চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করে, দৃষ্টিলোপ করে, অন্ধকার করে, পরে ক্রমে কাষ্ঠরাশি জলিতে আরম্ভ হইলে প্রথমে নিম্ন হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় দুই একটি শিখা আসিয়া অঙ্গের স্থানে স্থানে দংশন করে ; পরে সশব্দে অগ্নিজালা চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে ; শেষে প্রচণ্ডরবে অগ্নিরাশি গগনমণ্ডল জালাময় করিয়া মস্তক অতিক্রমপূর্ব্বক ভস্মরাশি করিয়া ফেলে।

নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না ; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জালা। মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল ; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল ; শেষে বহ্নিশিখাতে হৃদয় ভস্মীভূত লইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা, সেখানে একাকিনী যাইতেন ; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন ; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বন-ভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি এক দিনের তরে সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যন্ত্রণার প্রথমবেগের শমতা হইলে, নবকুমার নীরবে বসিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। রোদন করিয়া কিছু সুস্থির হইলেন। তখন তিনি কিংকর্ত্তব্যসম্বন্ধে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। আজ তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলা যখন সন্ধ্যার সময় বনাভিমুখে যাত্রা করিবেন, তখন গোপনে তাঁহার অনুসরণ করিবেন, তাহার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না ; আপনার প্রাণ সংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন ? এ জীবনের দুর্ব্বহ ভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।

এই স্থির করিয়া কপালকুণ্ডলার বহির্গমন-প্রতীক্ষায় তিনি খিড়কীদ্বারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। কপালকুণ্ডলা বহির্গতা হইয়া কিছু দূরে গেলে নবকুমারও বহির্গত হইতেছিলেন ; এমন সময়ে কপালকুণ্ডলা লিপির জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, দেখিয়া নবকুমারও সরিয়া গেলেন। শেষে কপালকুণ্ডলা পুনর্ব্বার বাহির হইয়া কিছু দূর গমন

করিলে, নবকুমার আবার তদনুগমনে বাহির হইতেছিলেন, এমত সময়ে দেখিলেন, দ্বারদেশ আবৃত করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

কে সে ব্যক্তি, কেন দাঁড়াইয়া, জানিতে নবকুমারের কিছুমাত্র ইচ্ছা হইলনা—তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। কেবল কপালকুণ্ডলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য ব্যস্ত। অতএব পথমুক্তির জন্য আগন্তুকের বক্ষে হস্ত দিয়া তাড়িত করিলেন। কিন্তু তাহাকে সরাইতে পারিলেন না।

নবকুমার কহিলেন,—"কে তুমি? দূর হও—আমার পথ ছাড়।"

আগন্তক কহিল, "কে আমি, তুমি কি চেন না? শব্দ সমুদ্রনাদবৎ কর্ণে লাগিল। নবকুমার চাহিয়া দেখিলেন; দেখিলেন, সে পূর্ব্ব-পরিচিত জটাজূটধারী কাপালিক।

নবকুমার চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু ভীত হইলেন না। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল—কহিলেন, "কপালকুণ্ডলা কি তোমার সহিত সাক্ষাতে যাইতেছে?"

কাপালিক কহিল, "না।"

জ্বালিতমাত্র আশার প্রদীপ তথনই নির্ব্বাণ হওয়াতে নবকুমারের মুখ পূর্ব্ববৎ মেঘময় অন্ধকারাবিষ্ট হইল। কহিলেন "তবে তুমি পথ মুক্ত কর।"

কাপালিক কহিল, "পথ মুক্ত করিতেছি, কিন্তু তোমার সহিত আমার কিছু কথা আছে—অগ্রে শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "তোমার সহিত আমার কি কথা? তুমি আবার আমার প্রাণ-নাশের জন্য আসিয়াছ? প্রাণ গ্রহণ কর, আমি এবার কোন ব্যাঘাত করিব না। তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। কেন আমি দেবতুষ্টির জন্য শরীর না দিলাম? এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিলাম। যে আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, সেই আমাকে নষ্ট করিল। কাপালিক! আমাকে এবার অবিশ্বাস করিও না। আমি এখনই আসিয়া তোমাকে আত্মসমর্পণ করিব।"

কাপালিক কহিল, "আমি তোমার প্রাণবধার্থ আসি নাই। ভবানীর তাহা ইচ্ছা নহে। আমি যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা তোমার অনুমোদিত হইবে। বাটীর ভিতরে চল, আমি যাহা বলি তাহা শ্রবণ কর।"

নবকুমার কহিলেন, "এক্ষণে নহে। সময়ান্তরে তাহা শ্রবণ করিব, তুমি এখন অপেক্ষা কর, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সাধন করিয়া আসিতেছি।"

কাপালিক কহিল, "বৎস! আমি সকলই অবগত আছি, তুমি সেই পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিবে। সে যেথায় যাইবে, আমি তাহা অবগত আছি। আমি তোমাকে সে স্থানে সমভিব্যাহারে করিয়া লইয়া যাইব। যাহা দেখিতে চাহ দেখাইব—এক্ষণে আমার কথা শ্রবণ কর। কোন ভয় করিও না।"

নবকুমার কহিলেন, "আর তোমাকে আমার কোন ভয় নাই। আইস।"

এই বলিয়া নবকুমার কাপালিককে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসন দিলেন এবং স্বয়ং উপবেশন করিয়া বলিলেন, "বল।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুনরালাপে

"তদ্‌গচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যম্।"

—কুমারসম্ভব।

কাপালিক আসন গ্রহণ করিয়া দুই বাহু নবকুমারকে দেখাইলেন। নবকুমার দেখিলেন, উভয় বাহু ভগ্ন।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখরচ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দুইটি হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কাপালিক এ সকল বৃত্তান্ত নবকুমারের নিকট বিবরিত করিয়া কহিলেন, "বাহু দ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্ব্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি, ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।"

পরে কহিতে লাগিলেন, "ভূপতিত হইয়াই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার করদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, আর আর অঙ্গ অভগ্ন আছে, এমত নহে, আমি পতনমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। প্রথমে অবিচ্ছেদে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম। পরে ক্ষণে সজ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান রহিলাম, কয় দিন যে আমি এ অবস্থায় রহিলাম, তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয়, দুই রাত্রি একদিন হইবে। প্রভাতকালে আমার সজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পুনরাবির্ভূত হইল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমি এক স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। "যেন ভবানী—" বলিতে বলিতে কাপালিকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। "যেন ভবানী আসিয়া আমার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছেন। ভ্রূকুটি করিয়া আমায় তাড়না করিতেছেন; কহিতেছেন, 'রে দুরাচার! তোরই চিত্তাশুদ্ধিহেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্বকৃত্য ফল বিনষ্ট হইল। আমি তোর নিকট আর কখন পূজা গ্রহণ করিব না।' তখন আমি রোদন করিয়া জননীর চরণে অবলুণ্ঠিত হইলে তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যতদিন না পার, আমার পূজা করিও না।

"কত দিনে বা কি প্রকারে আমি আরোগ্য প্রাপ্ত হইলাম, তাহা আমার বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। কালে আরোগ্য পাইয়া দেবীর আজ্ঞা পালন করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিলাম। দেখিলাম যে, এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই। বাহুবল ব্যতীত যত্ন সফল হইবার নহে। অতএব ইহাতে এক জন সহচারী আবশ্যক হইল। কিন্তু মনুষ্যবর্গ ধর্ম্মে অল্পমতি—বিশেষ কলির প্রাবল্যে যবন রাজা, পাপাত্মক রাজশাসনের ভয়ে কেহই এমত কার্য্যে সহচর হয় না। বহু সন্ধানে আমি পাপীয়সীর আবাসস্থান জানিতে

পারিয়াছি। কিন্তু বাহুবলের অভাব হেতু ভবানীর আজ্ঞাপালন করিতে পারি নাই। কেবল মানসসিদ্ধির জন্য তন্ত্রের বিধানানুসারে ক্রিয়া-কলাপ করিয়া থাকি মাত্র। কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।

"বৎস! কপালকুণ্ডলা বধযোগ্যা—আমি ভবানীর আজ্ঞাক্রমে তাহাকে বধ করিব। সে-ও তোমার নিকট বিশ্বাসঘাতিনী—তোমারও বধযোগ্যা, অতএব তুমি আমাকে সে সাহায্য প্রদান কর। এই অবিশ্বাসিনীকে ধৃত করিয়া আমার সহিত যজ্ঞস্থানে লইয়া চল। তথায় স্বহস্তে ইহাকে বলিদান কর। ইহাতে ঈশ্বরীর সমীপে যে অপরাধ করিয়াছ, তাহার মার্জ্জনা হইবে; পবিত্র কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্যসঞ্চয় হইবে, বিশ্বাসঘাতিনীর দণ্ড হইবে; প্রতিশোধের চরম হইবে।"

কাপালিক বাক্য সমাপ্ত করিলেন। নবকুমার কিছুই উত্তর করিলেন না। কাপালিক তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "বৎস! এক্ষণে যাহা দেখাইব বলিয়াছিলাম, তাহা দেখিবে চল।"

নবকুমার ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া কাপালিকের সঙ্গে চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সপত্নীসম্ভাষে

"Be at peace : it is your sister that addresses you,
Requite Lucretia's love."

—Lucretia.

কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে ভগ্নগৃহমধ্যে গেলেন। তথায় ব্রাহ্মণকে দেখিলেন। যদি দিনমান হইত, তবে দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার মুখকান্তি অত্যন্ত মলিন হইয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী, কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন যে, "এখানে কাপালিক আসিতে পারে, এখানে কোন কথা অবিধি। স্থানান্তরে আইস।" বনমধ্যে একটি অল্পায়ত স্থান ছিল, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বৃক্ষরাজি; মধ্যে পরিষ্কার; তথা হইতে একটি পথ বাহির হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবেশী, কপালকুণ্ডলাকে তথায় লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে ব্রাহ্মণবেশী কহিলেন, "প্রথমতঃ আত্মপরিচয় দিই। কতদূর আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা আপনি বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবে। যখন তুমি স্বামীর সঙ্গে হিজলী প্রদেশ হইতে আসিতেছিলে, তখন পথিমধ্যে রজনীযোগে এক যবনকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তোমার কি তাহা মনে পড়ে?"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যিনি আমাকে অলঙ্কার দিয়াছিলেন?"

ব্রাহ্মণবেশধারিণী কহিলেন, "আমিই সেই।"

কপালকুণ্ডলা অত্যন্ত-বিস্মিতা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া কহিলেন, "আরও বিস্ময়ের বিষয় আছে—আমি তোমার সপত্নী।"

কপালকুণ্ডলা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "সেকি ?"

লুৎফ-উন্নিসা তখন আনুপূর্ব্বিক আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। বিবাহ, জাতিভ্রংশ, স্বামী কর্ত্তৃক ত্যাগ, ঢাকা, আগ্রা, জাহাঁগীর, মেহের-উন্নিসা, আগ্রাত্যাগ, সপ্তগ্রামে বাস, নবকুমারের সহিত সাক্ষাৎ, নবকুমারের ব্যবহার, গত দিবস প্রদোষে ছদ্মবেশে কাননে আগমন, হোমকারীর সহিত সাক্ষাৎ—সকলই বলিলেন। এই সময় কপাল-কুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগের বাটীতে ছদ্মবেশে আসিতে বাসনা করিয়া ছিলে ?"

লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, "তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে!"

কপালকুণ্ডলা চিন্তা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "তাহা কি প্রকারে সিদ্ধ করিতে ?"

লুৎফ-উন্নিসা। আপাততঃ তোমার সতীত্বের প্রতি স্বামীর সংশয় জন্মাইয়া দিতাম। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি, সে পথ ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি যদি আমার পরামর্শমতে কাজ কর, তবে তোমা হইতেই আমার কামনা সিদ্ধ হইবে। —অথচ তোমার মঙ্গলসাধন হইবে।

কপা। হোমকারীর মুখে তুমি কাহার নাম শুনিয়াছিলে ?

লু। তোমারই নাম। তিনি তোমার মঙ্গল বা অমঙ্গল কামনায় হোম করেন, ইহা জানিবার জন্য প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট বসিলাম। যতক্ষণ না তাঁহার ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ততক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলাম। হোমান্তে তোমার নামসংযুক্ত হোমের অভিপ্রায় ছলে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তোমার অমঙ্গলসাধনই হোমের প্রয়োজন। আমারও সেই প্রয়োজন। ইহাও তাঁহাকে জানাইলাম। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের সহায়তা করিতে বাধ্য হইলাম। বিশেষ পরামর্শ জন্য তিনি আমাকে ভগ্নগৃহমধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় আপন মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তোমার মৃত্যুই তাঁহার অভীষ্ট। তাহাতে আমার কোন ইষ্ট নাই। আমি ইহজন্মে কেবল পাপই করিয়াছি, কিন্তু পাপের পথে আমার এত দূর অধঃপাত হয় নাই যে, আমি নিরপরাধা বালিকার মৃত্যুসাধন করি। আমি তাহাতে সম্মতি দিলাম না। এই সময়ে তুমি তথায় উপস্থিত হইয়াছিলে। বোধ করি, কিছু শুনিয়া থাকিবে।

কপা। আমি ঐরূপ বিতর্কই শুনিয়াছিলাম।

লু। সে ব্যক্তি আমাকে অবোধ অজ্ঞান বিবেচনা করিয়া কিছু উপদেশ দিতে চাহিল। শেষটা কি দাঁড়ায়, ইহা জানিয়া তোমায় উচিত সংবাদ দিব বলিয়া তোমাকে বনমধ্যে অন্তরালে রাখিয়া গেলাম।

কপা। তার পর আর ফিরিয়া আসিলে না কেন ?

লু। তিনি অনেক কথা বলিলেন, বাহুল্যবৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে বিলম্ব হইল। তুমি সে ব্যক্তিকে বিশেষ জান। কে সে, অনুভব করিতে পারিতেছ ?

কপা। আমার পূর্ব্বপালক কাপালিক।

লু। সেই বটে, কাপালিক প্রথমে তোমাকে সমুদ্রতীরে প্রাপ্তি, তথায় প্রতিপালন, নবকুমারের আগমন, তৎসহিত তোমার পলায়ন, এ সমুদায় পরিচয় দিলেন। তোমাদের পলায়নের পর যাহা যাহা হইয়াছিল, তাহাও বিবরিত করিলেন। সে সকল বৃত্তান্ত তুমি জান না। তাহা তোমার গোচরার্থ বিস্তারিত বলিতেছি।

এই বলিয়া লুৎফ-উন্নিসা কাপালিকের শিখরচ্যুতি, হস্তভঙ্গ, স্বপ্ন সকল বলিলেন। স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন—চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন। লুৎফ-উন্নিসা বলিতে লাগিলেন, "কাপালিকের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ভবানীর আজ্ঞা-প্রতিপালন। বাহু বলহীন, এই জন্য পরের সাহায্য তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। আমাকে ব্রাহ্মণ-তনয় বিবেচনা করিয়া সহায় করিবার প্রত্যাশায় সকল বৃত্তান্ত বলিল। আমি এ পর্য্যন্ত এ দুষ্কর্ম্মে স্বীকৃত হই নাই। এ দুর্ব্বৃত্ত চিত্তের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু ভরসা করি যে, কখনই স্বীকৃত হইব না। বরং এ সঙ্কল্পের প্রতিকূলতাচরণ করিব, এই অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। কিন্তু এ কার্য্য নিতান্ত অস্বার্থপর হইয়া করি নাই। তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "কি করিব?"

লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর।

কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

লু। বিদেশে—বহুদূরে, তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাসদাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানস-লোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফ-উন্নিসাকে কহিলেন, "তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাসদাসীর প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

লুৎফ-উন্নিসা চমৎকৃত হইলেন, এরূপ আশু স্বীকারের কোন প্রত্যাশা করেন নাই। মোহিত হইয়া কহিলেন, "ভগিনি—চিরায়ুষ্মতী হও, আমার জীবনদান করিলে। কিন্তু আমি তোমাকে অনাথা হইয়া যাইতে দিব না। কল্য প্রাতে তোমার নিকট আমার এক জন বিশ্বাসযোগ্য চতুরা দাসী পাঠাইব। তাহার সঙ্গে যাইও। বর্দ্ধমানে কোন অতিপ্রধানা স্ত্রীলোক আমার সুহৃৎ—তিনি তোমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিবেন।"

লুৎফ-উন্নিসা এবং কপালকুণ্ডলা এরূপ মনঃসংযোগ করিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন যে, সম্মুখবিঘ্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। যে বন্যপথ তাঁহাদিগকে আশ্রয়স্থান হইতে

বাহির হইয়াছিল, সে পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কাপালিক ও নবকুমার তাঁহাদিগের প্রতি যে করাল দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তাহা কিছুই দেখিতে পান নাই।

নবকুমার ও কাপালিক ইহাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ততদূর হইতে তাহাদিগের কথোপকথনের মধ্যে কিছুই তদুভয়ের শ্রুতিগোচর হইল না। মনুষ্যের চক্ষুঃ-কর্ণ যদি সমদূরগামী হইত, তবে মনুষ্যের দুঃখস্রোত শমিত কি বর্দ্ধিত হইত, তাহা কে বলিবে ? লোকে বলিয়া থাকে, সংসাররচনা অপূর্ব্ব কৌশলময়।

নবকুমার দেখিলেন, কপালকুণ্ডলা আলুলায়িতকুন্তলা। যখন কপালকুণ্ডলা তাঁহার হয় নাই, তখনই সে কুন্তল বাঁধিত না। আবার দেখিলেন যে, সেই কুন্তলরাশি আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া তাঁহার অংসসংবিলম্বী কেশদামের সহিত মিশিয়াছে। কপালকুণ্ডলার কেশরাশি ঈদৃশআয়তনশালী এবং লঘুস্বরে কথোপকথনের প্রয়োজনে উভয়ে এরূপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া বসিয়াছিলেন যে, লুৎফ-উন্নিসার পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কপাল-কুণ্ডলার কেশের সম্প্রসারণ হইয়াছিল। তাহা তাঁহারা দেখিতে পান নাই। দেখিয়া নবকুমার ধীরে ধীরে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

কাপালিক ইহা দেখিয়া নিজ কটিবিলম্বী এক নারিকেলপাত্র বিমুক্ত করিয়া কহিল, "বৎস! বল-হারাইতেছ, এই মহৌষধ পান কর, ইহা ভবানীর প্রসাদ। পান করিয়া বল পাইবে।"

কাপালিক নবকুমারের মুখের নিকট পাত্র ধরিল। তিনি অন্যমনে পান করিয়া দারুণ তৃষা নিবারণ করিলেন। নবকুমার জানিতেন না যে, এই সুস্বাদু পেয় কাপালিকের স্বহস্ত-প্রস্তুত প্রচণ্ড তেজস্বিনী সুরা। পান করিবামাত্র সবল হইলেন।

এ দিকে লুৎফ-উন্নিসা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে কপালকুণ্ডলাকে কহিতে লাগিলেন, "ভগিনি! তুমি যে কার্য্য করিলে, তাহার প্রতিশোধ আমার ক্ষমতা নাই, তবু যদি আমি চিরদিন তোমার মনে থাকি, সে-ও আমার সুখ। যে অলঙ্কারগুলি দিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়াছি, তুমি দরিদ্রকে বিতরণ করিয়াছ। এক্ষণে নিকটে কিছুই নাই। কল্যকার অন্য প্রয়োজন ভাবিয়া কেশমধ্যে একটী অঙ্গুরীয় আনিয়াছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় সে পাপ প্রয়োজনসিদ্ধির আবশ্যক হইল না। এই অঙ্গুরীয়টি তুমি রাখ। ইহার পরে অঙ্গুরীয় দেখিয়া যবনী ভগিনীকে মনে করিও। আজি যদি স্বামী জিজ্ঞাসা করেন, 'অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলে!' কহিও 'লুৎফ-উন্নিসা দিয়াছে।' ইহা কহিয়া লুৎফ-উন্নিসা আপন অঙ্গুলী হইতে বহুধনে ক্রীত এক অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কপালকুণ্ডলার হস্তে দিলেন। নবকুমার তাহাও দেখিতে পাইলেন। কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন, আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্য্যন্ত উন্মুলিত করিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলা লুৎফ-উন্নিসার নিকট বিদায় হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন নবকুমার ও কাপালিক লুৎফ-উন্নিসার অদৃশ্য-পথে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহাভিমুখে

"No spectre greets—no vain shadow this"
—Wordsworth.

কপালকুণ্ডলা ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে চলিলেন। অতি ধীরে ধীরে অতি মৃদু মৃদু চলিলেন। তাহার কারণ, তিনি অতি গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া যাইতেছিলেন; লুৎফ-উন্নিসার সংবাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাগ পরিবর্ত্তিত হইল; তিনি আত্ম-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফ-উন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকা-প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণসংহারে সঙ্কোচশূন্য, কপালকুণ্ডলাও সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জ্জনে তদ্রূপ। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদপ্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তি-ভক্তি শ্রবণ, দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুরাগ বিশিষ্ট প্রকারে জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টিশাসনকর্ত্রী মুক্তিদাত্রী, ইহা বিশেষমতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখদুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্যে ভক্তিপ্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই জগৎশাসনকর্ত্রী, সুখদুঃখ-বিধায়িনী, কৈবল্যদায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন?

তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসারমধ্যে ঘুরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্মকর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তাহা ইহলেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধান্ত হইল; নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসারমধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসারবন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপাল-কুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধনই ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে, কে তাহার গতিরোধ করে? একবার বায়ু-তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চারণ নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতিস্থাপন করিবে? নবীন করিকরভ মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?

কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব?" পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে?" প্রশ্ন করিতেছিলেন, অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। সংসারে অন্য কোন বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চভূতের এক বন্ধন আছে।

কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্যহৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্যসৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থও প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল।

যেন উর্দ্ধ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, "বৎসে!—আমি পথ দেখাইতেছি।" কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় উর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশ-মণ্ডলে নবনীরদ-নিন্দিত মূর্ত্তি! গলবিলম্বিতনরকপালমালা হইতে শ্রোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে—বামকরে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিত—লোচন-প্রান্তে বালশশী সুশোভিত। যেন ভৈরবী দক্ষিণহস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

কপালকুণ্ডলা উর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখন কপালমালিনীর অবয়ব মেঘে লুক্কায়িত হয়, কখন নয়নপথে স্পষ্ট বিকসিত হয়। কপালকুণ্ডলা তঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।

নবকুমার বা কাপালিক এ সব কিছুই দেখেন নাই। নবকুমার সুরা-গরলপ্রজ্বলিত-হৃদয়—কপালকুণ্ডলার ধীরপদক্ষেপে অসহিষ্ণু হইয়া সঙ্গীকে কহিলেন, "কাপালিক!"

কাপালিক কহিল, "কি?"

"পানীয়ং দেহি মে।"

কাপালিক পুনরপি তাঁহাকে সুরা পান করাইল।

নবকুমার কহিলেন, "আর বিলম্ব কি?"

কাপালিক উত্তর করিল, "আর বিলম্ব কি?"

নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, "কপালকুণ্ডলে!"

কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন, "তোমরা কে?" যমদূত?"

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "না না, পিতঃ, তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?"

নবকুমার দৃঢ়মুষ্টিতে কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র, মধুময় স্বরে কহিলেন, "বৎসে! আমাদিগের সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া কাপাপিক শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন;—যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে; এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিকগত পথপ্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্টবিমূঢ়ার ন্যায় বিনা-বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হস্তধারণ করিয়া চলিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রেতভূমে

"বপুষা করণোজ্‌ঝিতেন সা নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপ্তার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্‌॥"

—রঘুবংশ।

চন্দ্রিমা অস্তমিত হইল। বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল। কাপালিক যথায় আপন পূজাস্থান সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তথায় কপালকুণ্ডলাকে লইয়া গেলেন। সে গঙ্গাতীরে এক বৃহৎ সৈকতভূমি। তাহারই সম্মুখে আরও বৃহত্তর দ্বিতীয় এক খণ্ড সিকতাময় স্থান। সেই সৈকতে শ্মশানভূমি। উভয় সৈকতমধ্যে জলোচ্ছ্বাসকালে অল্প জল থাকে, ভাটার সময় জল থাকে না, এক্ষণে জল ছিল না। শ্মশানভূমির যে মুখ গঙ্গাসম্মুখীন, সেই মুখ অত্যুচ্চ, জলে অবতরণ করিতে গেলে একেবারে উচ্চ হইতে অগাধ জলে পড়িতে হয়। তাহাতে আবার অবিরতবায়ুতাড়িত-তরঙ্গাভিঘাতে উপকূলতল ক্ষয়িত হইয়াছিল; কখন কখন মৃত্তিকাখণ্ড স্থানচ্যুত হইয়া অগাধ জলে পড়িয়া যাইত। পূজাস্থানে দীপ নাই—কাষ্ঠখণ্ডমাত্রে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তদালোকে অতি অস্পষ্টদৃষ্ট শ্মশানভূমি আরও ভীষণ দেখাইতেছিল, নিকটে পূজা, হোম, বলি প্রভৃতির সমগ্র আয়োজন ছিল। বিশাল তরঙ্গিণীহৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। চৈত্রমাসের বায়ু অপ্রতিহতবেগে গঙ্গাহৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল। তাহার কারণে তরঙ্গাভিঘাতজনিত কলকলরব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল; শ্মশানভূমিতে শবভুক্‌ পশুগণ কর্কশকণ্ঠে ক্বচিৎ ধ্বনি করিতেছিল।

কাপালিক, নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে উপযুক্ত স্থানে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া তন্ত্রাদির বিধানুসারে পূজারম্ভ করিলেন। উপযুক্ত সময়ে নবকুমারের প্রতি আদেশ করিলেন যে, কপালকুণ্ডলাকে স্নাত করাইয়া আন। নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একটা জলপূর্ণ শ্মশানকলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়াছিল—হতভাগার কেহ সৎকার করে নাই। দুই জনেরই তাহাতে পদস্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে বেড়িয়া গেলেন, নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক বেড়িয়া শবমাংসভুক্‌ পশুসকল ফিরিতেছিল। মনুষ্য দুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল, কেহ বা পদশব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন, নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক, নিষ্কম্প।

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বামিন্‌, ভয় পাইতেছ?"

নবকুমারের মদিরার মোহ ক্রমে শক্তিহীন হইয়া আসিতেছে। অতি গম্ভীরস্বরে নবকুমার উত্তর করিলেন, "ভয়ে, মৃন্ময়ি? তাহা নহে।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে কাঁপিতেছ কেন?"

এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে কহিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে, আসন্নকালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?

নবকুমার কহিলেন, "ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, তাই ক্রোধেকাঁপিতেছি।"

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, "কাঁদিবে কেন ?"

আবার সেই কণ্ঠ !

নবকুমার কহিলেন, "কাঁদিব কেন ? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ী ! তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই"—বলিতে বলিতে নবকুমারের কণ্ঠস্বর যাতনায় রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। "তুমি ত কখন আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই !" এই বলিয়া সহসা নবকুমার চীৎকার করিয়া রোদন করিতে করিতে কপালকুণ্ডলার পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

"মৃন্ময়ী !—কপালকুণ্ডলে ! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমার হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।"

কপালকুণ্ডলা হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই ?"

যখন এই কথা হইল, তখন উভয়ে একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ; কপালকুণ্ডলা অগ্রে, নদীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ছিলেন, তাঁহার পশ্চাতে এক পদ পরেই জল। এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল, কপালকুণ্ডলা একটা আড়রির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই !"

নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, "চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃন্ময়ী ! বল—বল—বল—আমায় রাখ। গৃহে চল !"

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম ! কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন ! তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।"

"না—মৃন্ময়ী !—না।—"এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন ; কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্রবায়ু-তাড়িত এক বিশাল নদীতরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল : অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলার সহিত ঘোররবে নদী-প্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।

নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।

সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল ?

সমাপ্ত